আসহাবে কাহাফ
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

আসহাবে কাহাফ

[গুহার সহচর]

অনুবাদ ঃ

আখতার ফারুক

প্রধান পরিবেশক ঃ

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

উপসর্গ

অক্লান্ত সমাজসেবী পিতা

মাওলানা ইদরীছ আহমদ সাহেবের

দস্ত মোবারকে—

এ দীন খেদমতটুকু তুলে দিতে পেরে

ধন্য হলাম

সূচীপত্র

ভূমিকা

পাক-ভারতীয় মুসলিম মনীষী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রচিত "আস্‌হাব্‌-ই-কহ্‌ফ্‌" একটি বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থ। বর্তমান "আস্‌হাবে কাহাফ" উর্দু "আস্‌হাব-ই-কহ্‌ফ্‌" গ্রন্থেরই অনুবাদ। বলাবাহুল্য, ইহাই এই গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ। এই গ্রন্থে কুর্‌আন শরীফের 'সূরা কহফে' বর্ণিত 'আস্‌হাব্‌-ই-কহ্‌ফ্‌' এবং 'জুল করনৈন' ও তৎসূত্রে 'য়াজুজ-মাজুজ' নামক কয়েকটি ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে এক গভীর গবেষণামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বাইবেলের ইতিহাস ও ভূগোল-ভিত্তিক উক্তি অবলম্বন করিয়া মধ্যযুগ হইতে যে বাইবেলীয় ইতিহাস ও ভূগোল রচিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ এত অধিক যে, একজনের জীবনে তাহাকে আয়ত্ত করাও কঠিন। দুঃখের বিষয়, মুসলমানেরা কুর্‌আন শরীফের ইতিহাস-ভূগোল-ভিত্তিক উক্তি অবলম্বন করিয়া এ যাবৎ তেমন কোন বিরাট ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার সাহায্যে তেমন কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য গড়িয়া তোলার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। জ্ঞানের রাজ্যে ইহা আমাদের দীনতারই পরিচায়ক। ফলে, এক শ্রেণীর স্বধর্মী ও বিধর্মীর নিকট কুর্‌আন শরীফ আজও পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

"আস্‌হাব্‌-ই-কহ্‌ফ্‌" নামক উর্দু গ্রন্থে মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সর্বপ্রথম কুর্‌আন শরীফ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর গবেষণামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেন। পুস্তকটি যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রচিত ইসলাম ধর্ম-ভিত্তিক একটি প্রামাণিক ইতিহাস, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দিক হইতে গ্রন্থটির মূল্য শুধু মুসলমানের নিকট নহে, বিশ্বের কুর্‌আন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছেও অপরিমেয়। ইহাতে এক-দিকে যেমন গবেষণামূলক কুর্‌আন-ভিত্তিক ইতিহাস রচনা চরমোৎকর্ষ

লাভ করিয়াছে, অন্যদিকে তেমন নিস্পৃহ ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমন পুস্তকের ভাষা সচরাচর সাধারণ হয় না। তদুপরি, মৌলানা আজাদের ন্যায় মহাপণ্ডিতের হাতে পড়িয়া ইহার ভাষা এক অসাধারণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন ভাষার বঙ্গানুবাদ সত্যই কঠিন। জনাব আখতার ফারুক সাহেব এই কঠিন কাজটি কৃতিত্বের সহিত সমাধা করিয়াছেন। ইহাই আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছে।

অনুবাদক একজন আলিম হওয়া সত্বেও, ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইল, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের 'আলিম সমাজ এখনও বাংলা ভাষার চর্চায় একরূপ বিমুখ। কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় তাঁহাদের মধ্য হইতে যে দুই একজন 'আলিম ছিটকাইয়া পড়িয়া বাংলা ভাষার চর্চা করিয়াছেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁহারা হয় মাত্রাতিরিক্ত সংস্কৃতের, নয় অস্বাভাবিক আরবী-ফারসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বাভাবিক বাংলা ভাষাকে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। সুখের বিষয়, তরুণ 'আলিমদের মধ্যে যাঁহারা মাতৃভাষার চর্চা করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক না হইলেও, মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা যেমন অধিক, ইহার চর্চায়ও তাঁহারা তেমন নিবিষ্ট মনে তৎপর। ইহা জাতির পক্ষে একটি শুভ লক্ষণ।

এই গ্রন্থের অনুবাদক জনাব আখতার ফারুক সাহেব এমনই একজন তরুণ 'আলিম। সম্প্রতি তিনি বাংলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দেওয়ার জন্যও প্রস্তুত হইতেছেন। ইহাও একজন 'আলিমের পক্ষে খুব সাধারণ ব্যাপার নহে। বোধ হয়, এই সমস্ত কারণেই তাঁহার অনুবাদে কোথাও অনুবাদ-সুলভ আড়ষ্টতা নাই; অথচ অনুবাদ একান্তই মূলানুসারী। মূল ও অনুবাদের ভাষায় অনুবাদকের সমান অধিকার না থাকিলে এমনটি সম্ভবপর নহে। বলাবাহুল্য, ফারুক সাহেবের উর্দু ও বাংলা ভাষায় তেমন অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার কোন অবকাশই নাই। তাঁহার ভাষা এমনই প্রাঞ্জল যে, পড়িতে পড়িতে ইহাকে মৌলিক রচনা বলিয়াই ভ্রম হয়। যে-কোন অনুবাদকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। একজন মাদ্রাসা পাশ 'আলিমের পক্ষে তো কোন কথাই নাই।

ধর্ম-প্রীতি জ্ঞান-সাধনা ও জাতির সেবাই তাঁহাকে এই অনুবাদে প্রেরণা দান করিয়াছে। যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থটি উর্দু ভাষার মণিকোঠায় আবদ্ধ থাকিয়া বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের নিকট এতদিন অজ্ঞাত ছিল, তাহা জনাব আখতার ফারুক সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় অনূদিত হইয়া তাহাদের নিকট সুপরিচিত হইবে, ইহাও কম আনন্দের কথা নহে। বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থের একান্তই অভাব বলিয়া যে একটি অপবাদ সচরাচর শুনা যায়, সেই অপবাদও এই গ্রন্থ প্রকাশে কতকটা অপনোদিত হইবে। অধিকন্তু, ইহা আমাদের বাংলা-নবীশ পাণ্ডিত্যাভিলাষীদের জন্য যে-কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার একটি চমৎকার অভিজ্ঞানরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াও বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ব্যাপার। কারণ, একমাত্র এই জাতীয় গ্রন্থই আমাদের চিরাচরিত ধর্মীয় চিন্তা ও গবেষণার ধারায় পরিবর্তন আনিয়া দিতে সমর্থ। তবে, এই মন্তব্য মানোন্নত মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যতখানি সত্য, জনসাধারণের পক্ষে ততখানি সত্য নহে। এতৎসত্বেও, সাধারণ পাঠকের মানসিক ঔৎসুক্য উদ্রেকে এই গ্রন্থ যে ব্যর্থ, তেমন কথা বলিতে পারা যায় না। কেননা, ইহাতে চিন্তার খোরাকের পরিমাণও পর্যাপ্ত। আশা করা যায়, গ্রন্থটির আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আমাদের শিক্ষিত ও 'আলিম সমাজ কুর্‌আন শরীফের ইতিহাস ও ভূগোল ভিত্তিক অন্যান্য উক্তি অবলম্বন করিয়া মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইবেন। যেই দিন বাংলা-ভাষা এই সৌভাগ্য লাভ করিবে, সেই দিন এই ভাষায়,—বিশেষ করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলা ভাষার (তদানীন্তন) উন্নতির আর একটি নূতন ধাপ রচিত হইবে।

এই ভাবী শুভ দিনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া এই গ্রন্থের অনুবাদক ও প্রকাশক,—উভয়কেই আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহারা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা শুধু ধর্মের নহে, জ্ঞান ও জাতির অকুণ্ঠ সেবার কাজ। আমার ধারণা,—এই শ্রেণীর কাজের কথা স্মরণ রাখিয়াই বলা হইয়াছে—

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ خَيْرٌ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ

মিদাহু-ল্ উলমা-ই খৈরুম্ মিন্ দিমা'-শ্-শুহাদা ই

অর্থাৎ

"আলিমদের (জ্ঞানীদের) কালি শহীদদের শোণিত হইতেও উত্তম"। কেননা, তাঁহাদের গ্রন্থের ফলশ্রুতি দেশ, কাল ও পাত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া যতখানি সুদূরপ্রসারী হয়, শহীদের রক্তদানের ফল ততখানি সুদূরপ্রসারী হয় না। আমরা বিশ্বাস করি, অনূদিত গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে অনন্তপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে।

অনুবাদক তরুণ। তথাপি, তাঁহার অনুবাদে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নাই—বরং বিজ্ঞবত্তার ছাপ আছে। পুস্তকের কোথাও কোথাও ভাষাগত ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলেও, ইহার পরিমাণ এত অল্প যে, এইগুলি সহজেই উপেক্ষণীয়। জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের অনুবাদ দিয়াই, তাঁহার মাতৃভাষা-সাধন আরম্ভ হইল। মনে হইতেছে,—ইহা তাঁহার জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশের প্রস্তুতি মাত্র এবং তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান-চর্চায় আত্মনিয়োগের দৃঢ় বাসনা পোষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অনন্ত বিস্তৃত জ্ঞান-রাজ্যের কোন-না-কোন দিকের অধিকারী করুন, ইহাই দোয়া করিতেছি।

ইতি—

বাংলা একাডেমী,
বর্ধমান হাউস, ঢাকা।
১০ই জুন ১৯৬৩ ইংরেজী

মুহাম্মদ এনামুল হক
পরিচালক
বাংলা একাডেমী

অনুবাদকের কথা

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন—Living Encyclopaedia-জীবন্ত বিশ্বকোষ। রাজনীতির ছায়া যদি জীবনে তিনি নাও মাড়াতেন, পাণ্ডিত্যই তাঁকে অমর করে রাখত—করত জগৎ-জোড়া খ্যাতির মালিক। তাঁর যে কোন রচনা পড়লে বিস্মিত হতে হয়, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে, প্রশ্ন জাগে মনের কোণে—রাজনীতি যাঁর জীবনে পরম ও চরম ব্রত, এত সাধনার অবসর তিনি পেলেন কখন?

মাত্র চৌদ্দ বছরে যিনি শিক্ষা জীবনের শেষ অধ্যায় পার হলেন, সতের বছরে 'আল-হেলাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সেজে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের 'জনক' আখ্যা পেলেন, আর তার সঙ্গে পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবী নেতারূপে বৃটিশ সরকারের সুনজরে (?) বন্দী হলেন—সারা উপমহাদেশে যাঁর জয়জয়কারে প্রাণচাঞ্চল্যের প্লাবন বয়ে চলল, গান্ধী যাঁর সখ্যতা যেচে নিলেন মুগ্ধ চিত্তে, নেহেরু যাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে হলেন ধন্য, আর যাই হোন বা না হোন--বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি, তিনি শতাব্দীর অবদান।

'আসহাবে কাহাফ' তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের একটা অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। শেষ যুগের মুফাস্‌সির (কোর্‌আনের স্বীকৃত ব্যাখ্যাকার) তিনি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নব অবদানকে অকৃপণ হাতে ব্যবহার করে কুরআনের রহস্যপূর্ণ গুহাগুলোকে করে তুলেছেন তিনি আলোকোজ্জ্বল, সহজ ও সুন্দর। 'বুজুর্গের ভুল ধরা মহাপাপ' প্রবাদকে অবজ্ঞা দেখিয়ে, 'ইজতেহাদের রুদ্ধ দ্বার'কে ভেঙ্গে দিয়ে, জ্ঞানগর্ভ মুক্তবুদ্ধির শাণিত বিশ্লেষণকে তিনি কোরআন তথা ইসলামের সঞ্জীবনী সুধারূপে প্রমাণ করেছেন।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত মনীষীদের চ্যালেঞ্জ—'আসহাবে কাহাফ', 'জুল-কারনায়েন' ও 'ইয়াজুজ-মাজুজ' মোহাম্মদ (দঃ)-এর সরল বিশ্বাসের সূক্ষ্ম পথে ইয়াহুদীদের চক্রান্তেই কোরআনে ঢুকে পড়েছে, কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই সে-সবের—এর দাঁতভাংগা জবাব দিলেন মাওলানা আজাদ

তাঁর যাদুকরী প্রতিভার বলে 'যার লাঠি তার মাথায় ভেংগেই'। চিন্তা জগতে তাই 'আসহাবে কাহাফ' এক যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করবে।

মুক্ত বুদ্ধির সুযোগ যেখানে, মতভেদের অবকাশ সেখানে থাকবেই। মাওলানা আজাদের রাজনীতির সাথে আমাদের মতান্তর ছিল অনেকেরই। তবুও শ্রদ্ধা করেছি তাঁর নৈতিক দৃঢ়তাকে, মেনে নিয়েছি তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও মনীষার কথা। তেমনি 'আসহাবে কাহাফ'-এ তাঁর সবগুলো মতামতই যে চূড়ান্ত এবং সবাই তাতে একমত হবেন, এমন দাবী করা চলে না — তিনিও তা করেননি। তবে, কোরআনের গূঢ়তম রহস্যাবলীর দ্বারোদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী — "যাদেরে বিজ্ঞান দিয়েছি, তাদের অশেষ কল্যাণ দান করেছি" — যে কতখানি সত্য তা তিনিই আমাদের দু'-চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন।

বিজ্ঞানের দৈনন্দিন অগ্রগতি যেন ইঙ্গিতময় কোরআনের ক্রমাগত বিশ্লেষণ — 'আসহাবে কাহাফ'-এ মাওলানা আজাদের দর্শন এটাই।

মাওলানা আজাদের সাবলীল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা, অন্তলস্পর্শী ভাব ও রহস্যপূর্ণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়বস্তুর যথাযথ ভাষান্তর দুরূহ ব্যাপার বটে। বিশেষ করে তাঁর যে রচনা বর্ণনামূলক না হয়ে বিশ্লেষণধর্মী হয়, তার অনুবাদ অবশ্যই দুঃসাহসের কাজ। সেক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হয়েছে তা পাঠক মহলেরই বিচার্য — আমার নয়।

শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সা'বের মত সর্বমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমার মত নগণ্য লেখককে যেভাবে ধন্য করলেন, আজীবন শোকরিয়া আদায় করেও সে ঋণ শোধ করতে পারব না।

'বুক সোসাইটি' 'আসহাবে কাহাফে'র প্রকাশনার ভার নিয়ে যে রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছে, তা সত্যই প্রশংসনীয়। ঐতিহ্যভিত্তিক অনুবাদ সাহিত্যের দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ব্রত নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান এভাবে এগিয়ে চলবে, তারা অবশ্যই বাঙ্গালী সমাজের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ পাবে। এ প্রতিষ্ঠানের রুচিবোধ ও বাংলা ভাষার প্রতি দরদ অক্ষুণ্ণ ও অকৃত্রিম হোক, এটাই প্রার্থনা। খোদা হাফেজ।

আরজ গুজার —

২১/৬/৭৬ ইং

আখতার ফারুক

আসহাবে কাহাফ

সারকথা

....

সূরায়ে কাহাফের নবম আয়াত হইতে আসহাবে কাহাফের কাহিনী শুরু হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন :

'যুবকদের এই দলটি কেবলমাত্র খোদার দয়ার উপর নির্ভর করিল এবং একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়া আত্মগোপন করিল। কয়েক বৎসর তাহারা তথায় অবস্থান করিল। নগর বা জনপদের সহিত তাহাদের আদৌ সম্পর্ক রহিল না। এমনকি জীবন প্রবাহের কোনই ঝংকার তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। অতঃপর তাহাদিগকে জাগ্রত করা হইল; অর্থাৎ তাহারা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। বস্তুতঃ, এই সমস্ত ঘটনার মাধ্যমে উভয় দলের মধ্যে কোন দল যুগের প্রবাহ ও পরিণতি সম্পর্কে যথার্থ সচেতন, তাহাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য।

উভয় দল বলিতে আসহাবে কাহাফ এবং তাহাদের দেশবাসীর কথা বুঝান হইয়াছে। মুলতঃ, ইহাই সমগ্র ঘটনার সারকথা।

অতঃপর উহার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দান করা হইতেছে। যেমন, ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হইয়াছে :

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ০

(আমি আপনার নিকট তাহাদের সংবাদ দান করিতেছি।)

এক

কোন এক ভ্রান্ত ও অত্যাচারী জাতির কতিপয় সত্যানুসারী যুবক নির্জন—

বাসের উদ্দেশ্যে এক পর্বত গহ্বরে আত্মগোপন করিয়াছিল। (কেননা) তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে উড়াইয়া দেওয়া কিংবা জোর জবরদস্তি সহকারে স্বধর্মে ফিরাইয়া লওয়াই ছিল তাহাদের জাতির পরম ও চরম অভিলাষ। (কিন্তু) তাহারা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিল, তথাপি সত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিল না।

দুই

সেই গুহাভ্যন্তরে পুনর্জাগরিত হইয়া তাহারা তাহাদের নিদ্রাকাল নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হইল। অবশেষে নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য শহরে প্রেরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতাও অবলম্বন করিল যেন কেহ তাহাদের সম্পর্কে অবহিত হইতে সমর্থ না হয়। কিন্তু বিধির বিধান ছিল বিপরীত। ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং উহা মানব জাতির জন্য স্মরণীয় হইয়া দাঁড়াইল।

তিন

যেই জাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা পর্বত গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই পরবর্তীকালে তাহাদের এতখানি ভক্ত সাজিল যে, তাহাদের চিরনিদ্রা স্থলে তাহারা একটি উপাসনালয় নির্মাণ করিল।

চার

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ মানুষের অপরিজ্ঞাত। ফলে, বিভিন্ন ধরনের কথা সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলিতেছে : তাহারা তিনজন ছিল। অপর দল বলিতেছে : পাঁচজন। আর একদল বলে : সাতজন। মূলতঃ তাহারা অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতেছে। আদতে, মাথা ঘামাইবার ব্যাপার তো সংখ্যা সমস্যা নহে ; বরং সত্যানুরাগের ক্ষেত্রে তাহারা কোন স্তরে পৌঁছিয়াছিল, তাহাই তো ভাবিয়া দেখা উচিত।

বিশ্লেষণ

'আসহাবে কাহাফ': ঈসায়ী ধর্মের প্রাথমিক যুগে এরূপ কতিপয় ঘটনা পরিদৃষ্ট হয় যে, দৃঢ়বিশ্বাসী ঈসায়ীগণ বিরুদ্ধবাদীদের পৈশাচিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইভাবে তাহারা প্রাণভয়ে লোকালয় ছাড়িতে বাধ্য হইল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তাহারা সেই নির্জন গুহাভ্যন্তরেই মানবলীলা সম্বরণ করিল। অতঃপর কয়েক যুগ পরে তাহাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইল।

অনুরূপ একটি ঘটনা রোমের নিকটবর্তী একটি স্থানেও ঘটিয়াছে। এন্টিয়কেও এই ধরনের একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে বলিয়া জানা যায়। ইফসিস সম্পর্কেও অনুরূপ জনশ্রুতি রহিয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন জাগে, সুরায়ে কাহাফে বর্ণিত ঘটনা কোথায় ঘটিয়াছিল? কোরআন শরীফে 'কাহাফ' শব্দটির সঙ্গে 'আর-রকীম' শব্দটিও ব্যবহার করা হইয়াছে। তাই, কতিপয় তাবেয়ী ইমাম উহা দ্বারা এই মর্ম উদ্ঘাটন করিলেন, 'রকীম' একটি শহরের নাম। কিন্তু সাধারণ্যে অনুরূপ কোন শহরের নাম পরিচিত নহে বলিয়া অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, 'রকীম' শব্দের অর্থ এখানে লিখন বা অংকন। অর্থাৎ আসহাবে কাহাফদের গুহার উপরে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে আসহাবে রকীমও বলা হইয়াছে।

'আর রকীম': অবশ্য তৌরাত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে তাঁহারা সহজেই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেন, উক্ত 'রকীম' তৌরাতে 'রাকীম' নামে অভিহিত হইয়াছে। আর মূলতঃ উহা একটি শহরের নাম। পরবর্তীকালে উহাই 'পেট্রা' নামে খ্যাত হইয়াছে এবং আরবীতে উহাকেই বলা হয় 'বেতরা'।

মহাযুদ্ধের পর প্রাগৈতিহাসিক তথ্যাবলী ও অতীতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনের ক্ষেত্রে যে নূতন নূতন দিক উন্মুক্ত

হইয়াছে পেট্রাও উহার আওতাভুক্ত হইয়াছে। এমন কি পেট্রার আবিষ্কার বিতর্ক ও গবেষণার নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে।

সীনাই উপত্যকা ও আকাবা উপসাগর হইতে সোজাসুজি উত্তরদিকে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে, দুইটি পর্বতমালা সমান্তরালভাবে চলিয়াছে, এবং ভূখণ্ড ক্রমশঃ উঁচু হইয়া চলিয়াছে। এই এলাকায় 'নাবাতী' সম্প্রদায় বসবাস করিত এবং এখানকার মালভূমিতে রকীম শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমকগণ যখন সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনকে একত্রিত করিয়া ফেলিল, তখন সেখানকার অন্যান্য শহরের ন্যায় রকীমও তাহাদের নূতন আবাসভূমিরূপে পরিগণিত হইল। এই হইতেই উহা পেট্রা নাম ধারণ করিল। এতদ্ভিন্ন উহার বিরাট বিরাট মন্দির ও প্রেক্ষাগৃহের জগৎজোড়া খ্যাতি লাভও এই সময়ে ঘটিয়াছিল। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানগণ উক্ত এলাকা জয় করিল, তখন উহার রকীম নামের ব্যবহার একান্তই বিরল ছিল।

মহাযুদ্ধের পর হইতে উক্ত এলাকায় নূতনভাবে নিদর্শন-অনুসন্ধান কার্য চালু করা হইয়াছে এবং নব নব তথ্য উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত এলাকায় আশ্চর্য ধরনের পর্বত গহ্বর রহিয়াছে এবং সেইগুলি দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। উহার প্রশস্ততাও অনেক। অধিকন্তু উহার অবস্থিতি এইরূপ যে, সূর্যালোক কিছুতেই উহার অভ্যন্তরে পেঁাছিতে পারে না।

এই তথ্যোদ্ঘাটনের পরে স্বভাবতই এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আসহাবে কাহাফের ঘটনা এই গুহায়ই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কোরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উহাকেই 'আর-রকীম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তদুপরি, উক্ত নামে যখন একটি শহর ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন 'রকীম' শব্দের অর্থ লইয়া গলদঘর্ম হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত তথ্যাদি ছাড়া ইহার সমর্থনে আরও নিদর্শন মিলিতেছে। কোরআন পাকে যেভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব হইতেই এই কাহিনী আরবদেশে খ্যাত ছিল। আরব অধিবাসীগণ ইহা লইয়া তর্ক করিত এবং ইহাকে অত্যন্ত

আশ্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আরবের পৌত্তলিকগণ শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ছিল নেহায়েত পশ্চাৎপদ এবং তাহাদের জ্ঞানের পরিসরও ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সে অবস্থায় তাহাদের এই সুপরিচিত ঘটনাটি নিকটবর্তী এলাকা হওয়াই সম্ভব। তাহাদের জানাশোনা যেহেতু মেলামেশার উপর নির্ভরশীল ছিল, তাই শুধুমাত্র আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসীদের সংগেই তাহা সংশ্লিষ্ট ছিল।

এখন প্রশ্ন হইল, তাহারা কোন্ এলাকার? যদি ইহাকে পেট্রার ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রথমত, উহা আরবের নিকটবর্তী স্থান অর্থাৎ আরব সীমান্ত হইতে উহা ষাট হইতে সত্তর মাইলের মধ্যে অবস্থিত। দ্বিতীয়ত, নাবাতীদের ছিল উহা আবাসভূমি এবং তাহাদের বাণিজ্যবহর সচরাচর হেজাজে আসা-যাওয়া করিত। নিঃসন্দেহে উক্ত ঘটনা নাবাতী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত ছিল এবং তাহাদের নিকট হইতেই আরববাসীগণ শুনিয়া থাকিবে।

পক্ষান্তরে মক্কার কোরেশগণের বাণিজ্যবহরও প্রতি বৎসর সিরিয়ায় যাতায়াত করিত। রোমকগণ আকাবা হইতে মার্মুর উপকূল পর্যন্ত যে রাজপথ তৈরী করিয়াছিল, আরবগণ সেই পথেই তাহাদের এই সুদীর্ঘ সফর অভিযান পরিচালনা করিত। পেট্রা সেই রাজপথেরই পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।[১] অধিকন্তু উহা তদঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল। সুতরাং ইহাই সব চাইতে স্বাভাবিক যে, উক্ত ঘটনা এইভাবেই আরববাসীদের গোচরীভূত হইয়াছিল।

এ ব্যাপারটি আরও কয়েকটি আয়াতের বিশ্লেষণ সাপেক্ষ বটে।

---

১ মহাযুদ্ধের পরে সন্ধান কার্যচালানোর ফলে উক্ত রাজপথ আগাগোড়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে পুরাতন চিহ্নের উপর উহা নূতনভাবে তৈরী করা হইতেছে। এমন কি আকাবা হইতে আম্মান পর্যন্ত পুনর্নির্মাণের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। আকাবার প্রাচীন নাম তারসীস। সেখান হইতে হজরত সোলায়মানের (আঃ) জাহাজ ভারতে যাতায়াত করিত। লোহিত সাগর অঞ্চলের উহাই ছিল বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আসল ঘটনা

(ক) সূরায়ে কাহাফের নবম আয়াতটি এই :

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

(আপনি কি ধারণা করিতেছেন যে, আসহাবে কাহাফ ও রকীম আমার আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর অন্যতম।)

বলা বাহুল্য, আয়াতে সম্বোধনের ধরন দৃষ্টে সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, একদল লোক অবশ্যই 'আসহাবে কাহাফ ও রকীম' নামে খ্যাত ছিল। আর তাহাদের ঘটনাটি খোদার কুদ্‌রতের অন্যতম আশ্চর্য নিদর্শন রূপে বিবেচিত হইত। জনসাধারণ ইসলামের পয়গম্বরের নিকট আলোচনা করায় আল্লাহ্ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে উহার রহস্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যাহা হউক, প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে উহার সারকথা এবং পরিণতির যথাযথ রূপটি প্রকাশ করা হইয়াছে। উহাতে বাহুল্যের কোনই স্থান নাই। সুতরাং জ্ঞান ও উপদেশের জন্য উহাই যথেষ্ট। অতঃপর ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হইয়াছে : এখন আমি আপনার নিকট সেই ঘটনাটি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি। অর্থাৎ সারকথা প্রকাশের পরে উহার বিস্তারিত বিবরণ দান করা হইতেছে।

দশম হইতে দ্বাদশ আয়াত পর্যন্ত যে সংক্ষিপ্তসার ব্যক্ত করা হইয়াছে, মূলত সমগ্র কাহিনীর মর্ম উহাই। সুতরাং পরবর্তী বিবরণটিও উক্ত মর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে এবং উহা পাঠের সময় উক্ত মর্ম ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিবরণটি এই :

'কতিপয় যুবক সত্যানুসরণের খাতিরে দুনিয়া এবং দুনিয়ার আয়েশ-আরাম ত্যাগ করিল। তাহারা এক পর্বত-গহ্বরে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদের পশ্চাতে ছিল অত্যাচারের ষ্টিমরোলার আর সম্মুখে গুহার ভয়াবহ অন্ধকার। তবুও তাহারা বিন্দুমাত্র টলিল না। তাহারা বলিল : 'প্রভো!

তোমার দয়ার ছায়াতলে আশ্রয় চাহিতেছি ; আর শুধু মাত্র তোমার উপর নির্ভর করিতেছি।' সেইভাবে কয়েক বৎসর অবধি তাহারা সেখানে কাটাইল এবং তথায় তাহারা এরূপভাবে ছিল যে, পার্থিব কোন ব্যাপার তাহাদের কর্ণে পৌঁছিত না। অতঃপর আমি তাহাদিগকে উঠাইয়া দাঁড় করাইলাম। উদ্দেশ্য হইল, তাহাদের এবং বিরোধীদের মধ্যে কোন দল সেই যুগে সঠিক কার্যধারা ও ফলাফল সম্পর্কে যথার্থ ধারণা পোষণ করিত তাহা প্রমাণ করা।'

অর্থাৎ অবস্থাচক্রে সে-যুগেও দুইটি দল সৃষ্টি হইয়াছিল। একদল সত্যানুসারী আসহাবে কাহাফ, আরেকদল তাহাদের বিরোধী অসত্যপূজারী। অসত্যপূজারীগণ সত্যানুসারীদের উপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালাইতে বদ্ধপরিকর ছিল। এইভাবে উভয় দলই কয়েকটি বৎসর মাত্র অতিক্রম করিল। অতঃপর জালেম ও মজলুম উভয় দলই কালের গর্ভে বিলীন হইল। এখন দেখিবার বিষয় এই, উভয় দলের ভিতর কাহারা সাফল্যমণ্ডিত হইল আর কাহারা ব্যর্থকাম হইল। এই দুই দলের মধ্যে কোন্ দলটি যুগের প্রবাহ সম্পর্কে যথার্থ সচেতন ছিল ?

পরবর্তী আয়াতে এ কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে, অত্যাচারীদের অত্যাচারের আয়ুকাল খুবই কম ছিল এবং শেষ পর্যন্ত আসহাবে কাহাফের অনুসৃত নীতিই সাফল্যমণ্ডিত হইল। কেননা, এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় অচিরে ঈসায়ী ধর্ম সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে কয়েক বৎসর পরে যখন তাহারা পাহাড়ের গুহা হইতে বাহিরে আসিল এবং একজনকে শহরে প্রেরণ করিল, তখন আর ঈসায়ী হওয়া ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ রহিল না। পক্ষান্তরে উহা মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভের সবচাইতে বড় উপায় হইয়া দাঁড়াইল।

এক্ষণে সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সত্যানুসারীদের দৃঢ়তাই সত্যের আহ্বানকে জয়যুক্ত করিয়াছে। যদি তাহারা অত্যাচারে বিহ্বল হইয়া সত্য হইতে বিচ্যুত হইত, তাহা হইলে এই বিপ্লব কখনই বাস্তবায়িত হইত না।

(খ) অতঃপর আয়াতে ঘটনাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। যেমন, তখনও যাহারা খোদার পথে অগ্রসর হইত, তাহাদের বিরুদ্ধে দেশবাসী কোমর বাঁধিয়া অবতীর্ণ হইত। তবুও যদি সত্যানুসারী দল বিরত না হইত, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আসহাবে কাহাফ লোকালয় ছাড়িয়া যাইবার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং কোন এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করিয়া খোদার ধ্যানে মশগুল হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এইভাবে তাহারা পাহাড়ের অধিবাসী সাজিল।

গুহার স্বরূপ

তাহাদের একটি প্রভুভক্ত কুকুর ছিল। সেটিও তাহাদের সঙ্গে পাহাড়ে চলিয়া গেল। সেই পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত ছিল এবং মুখ খোলা ছিল, তথাপি সূর্যরশ্মি উহাতে প্রবেশ করিতে পারিত না। পূর্বাহ্ন কিংবা অপরাহ্নের উদয় ও অস্তগামী সূর্যের কিরণ উহাতে প্রবেশ করিত না। উহা উত্তরমুখী ছিল এবং উভয় কালেই সূর্য-রশ্মি উহার দক্ষিণ কিংবা বাম পার্শ্বে পতিত হইত। উত্তর দিকে ছিল সুড়ঙ্গের মুখ বা দক্ষিণ দিকটি ছিল নিষ্ক্রমণ পথ। সুতরাং আলো ও বাতাস উহাতে যথারীতি যাতায়াত করিত। শুধুমাত্র রৌদ্রের পথ ছিল সেখানে রুদ্ধ।

ইহা হইতে একই মুহূর্তে দুইটি ব্যাপার সহজে অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উহা নিতান্ত উপযোগী ও নিরাপদ স্থান ছিল। কেননা, আলো-বাতাসের পথ সেখানে উন্মুক্ত ছিল, আর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে সে-স্থান ছিল বিমুক্ত। অধিকন্তু উহার অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত ছিল। তাই স্থানের কোন অভাব সেখানে ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে প্রত্যক্ষকারিগণের দৃষ্টিতে উহা ভয়াবহ ছিল বৈ নহে। কেননা, আলো প্রবেশের পথ থাকায় উহা নিরেট অন্ধকারময় ছিল না। পক্ষান্তরে সম্মুখভাগ উত্তরমুখী হওয়ায় সূর্যরশ্মি হইতে উহা বঞ্চিত ছিল। ফলে, উহা কখনই উজ্জ্বল মনে হইত না। আলো ও আঁধার মিলিয়া আবছা ও অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইত। বাহির হইতে ঝুঁকিয়া তদ্রূপ স্থান প্রত্যক্ষ করিলে অবশ্যই ভয়াবহ মনে হইত।

আসহাবে কাহাফ কিছুকাল সেই গুহায় লুকাইয়া রহিল। অতঃপর তাহারা বাহিরে আসিয়া স্থির করিতে পারিল না, কতদিন তাহারা সেইখানে অবস্থান করিল। তাহারা তখনও শহরবাসিগণকে পূর্বের ন্যায় ভয়ের চক্ষে দেখিল। কেননা, ইত্যবসরে দেশে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল, সে সম্পর্কে তাহারা আদৌ অবহিত ছিল না। দেশে তখন তাহাদেরই ন্যায় সত্যানুসারী ও খোদার পুজারীর জয় জয়কার ছিল।

তাহাদের প্রেরিত ব্যক্তি শহরে পৌঁছিয়া এই অবস্থা সন্দর্শনে আশ্চর্য বোধ করিল। যাহারা একদিন তাহাদিগকে পাথরের আঘাতে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা এখন এতই ভক্ত সাজিল যে, সেই পাহাড়ের গুহা তাহাদের তীর্থস্থানে পরিণত হইল। এমন কি শহরের শাসকবৃন্দ তথায় একটি উপাসনাগার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

(গ) 'আসহাবে কাহাফ' এই দীর্ঘ সময় কিভাবে অতিবাহিত করিল ঃ সে সম্পর্কে কোরআনে শুধু এতটুকু আভাস পাওয়া যাইতেছে ঃ

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

(পর্বত গহ্বরে নির্ধারিত কয়েক বৎসর তাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আমি পার্থিব দিক হইতে বন্ধ রাখিলাম।)

বাক্যাংশ 'যরাব্‌না আ'লা আযানিহিম' এর মর্ম অনুসারী আয়াতের অর্থ ইহাই। অথচ তাফসীরকারগণ উহার অর্থ 'নিদ্রিত হওয়া' গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মতে কেবল নিদ্রামগ্ন অবস্থাতেই মানুষ বাহিরের কোন শোরগোল শুনিতে পায় না। সুতরাং আয়াতের যে অংশটিতে "শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ রাখিলাম' বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা তাহাদের নিদ্রিত অবস্থার প্রতিই ইংগিত দান করা হইয়াছে। তাফসীরকারদের এই ব্যাখ্যা বিতর্কসাপেক্ষ বটে। কেননা, আরবী পরিভাষায় শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ হওয়া দ্বারা কখনও নিদ্রা অর্থ করা হয় না। এই প্রশ্নের জওয়াবে তাহারা বলেন ইহা এক বিশেষ ধরনের ইংগিত। গভীর নিদ্রামগ্ন অবস্থাকে 'কর্ণ কুহর বন্ধ রাখা' এর সংগে তুলনা দান করা হইয়াছে। অবশ্য ইংগিতময় বাক্যের মর্মোদঘাটনের ব্যাপারে স্বাভাবিক হেরফের অবৈধ নহে।

আসহাবে কাহাফের মশহুর ঘটনা এই, তাহারা পাহাড়ের গুহায় বহুদিন অবধি নিদ্রিত ছিল। সুতরাং যাহা পূর্ব হইতে খ্যাত ছিল উহার ভিত্তিতেই যদি পরবর্তীকালের বর্ণনাসমূহ প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা আদৌ বিচিত্র ব্যাপার নহে। আরবে উক্ত ঘটনার বর্ণনাকারী নাবাতী সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। আমরা দেখিতেছি, তাফসীরকারগণের অধিকাংশ বিশ্লেষণ ধর্মীয় কাহিনীসমূহ প্রচারে খ্যাতিলাভকারী ঈসায়ী ও

ইয়াহুদীদের প্রদত্ত বর্ণনার ভিত্তিতে বিরচিত। উদাহরণ স্বরূপ যেহাক ৬ সদীকে ধরা যাইতে পারে।

যাহা হউক, 'যরব্ আলাল আযান' বাক্যাংশ দ্বারা যদি নিদ্রামগ্ন অবস্থাকেই ধরা হয়, তাহা হইলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই : তাহারা বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিল। তখন 'ছুম্মাবা-আ' ছনা' এর অর্থ দাঁড়াইবে, 'অতঃপর তাহাদিগকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিলাম।'

এক ব্যক্তি অস্বাভাবিক ভাবে বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকিয়াও জীবিত রহিল, এটা তেমন বিচিত্র কথা নহে। কেননা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ইহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। অনুরূপ উদাহরণ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও পাওয়া যায়। সে-ক্ষেত্রে খোদার কুদরত যদি আসহাবে কাহাফের বেলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়াই দীর্ঘদীন নিদ্রামগ্ন রাখা হইয়া থাকে, তাহা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ নাই। তবে, কোরআন শরীফে যেহেতু সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট-ভাবে কিছু বিবৃত হয় নাই, তাই সতর্কতার খাতিরে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কোন মতামত ব্যক্ত করা ঠিক নহে।

(ঘ) অষ্টাদশ আয়াতে বলা হইল :

وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ

(মনে করিবে তাহারা জাগ্রত, মূলত তাহারা নিদ্রিত।)

ইহাদ্বারা হয় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কার অবস্থা বলা হইয়াছে অথবা সে গুহার এক বিশেষ সময়কার অবস্থা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই আয়াতে ইহাও বুঝা যাইতেছে, দেশের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও আসহাবে কাহাফ নির্জনতা বর্জন করে নাই, বরং সে গুহায়ই ছিল। এমন কি তথায় তাহারা দেহত্যাগ করিল। অতঃপর গুহার অবস্থা দৃষ্টে বাহির হইতে প্রত্যক্ষকারিগণের নিকট মনে হইত, তাহারা জীবিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদের কুকুরটি গুহার দ্বারদেশে জীবিত কুকুরের ন্যায় সম্মুখে হাত বিছাইয়া বসিয়াছিল। অথচ মানুষ কিংবা কুকুর কিছুই তখন জীবিত ছিল না।

এতদসত্ত্বেও দর্শকগণ তাহাদিগকে জীবিত ও জাগ্রত মনে করিত কেন ?

যদি তাহাদের শুধু লাশ পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে সেগুলিকে কেহই ; জীবিত ও জাগ্রত মনে করিত না। 'রুকুদ' শব্দের অর্থ যদি নিদ্রাবস্থাও ধরা হয় এবং তাহারা যদি শুধু নিদ্রায় শায়িত অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তিকেইবা জাগ্রত মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

তাফসীরকারগণ এই জটিলতা উপলব্ধি করিয়াছেন। তবে উহার কোন সমাধান খুঁজিয়া পান নাই। একদল মন্তব্য করিয়াছেন, যেহেতু তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত ছিল, তাই জাগ্রত মনে হইত। যদি কোন অচেতন ও নিস্কল লাশ উন্মীলিত চক্ষু বিশিষ্টও হয়, তবু তাহাকে সচেতন ও জাগ্রত ভাবিবার কি কারণ থাকিতে পারে? সেক্ষেত্রে তো ইহাই বুঝা যাইবে যে, মৃত বটে, তবে চক্ষু খোলা রহিয়াছে।

অপর দল বলেন, কোরআনের—

نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ

(আমার ইঙ্গিতে তাহারা ডাইনে ও বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়াছে।)
আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে জাগ্রত বুঝাইবার কারণ সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। অর্থাৎ যেহেতু ডাইনে এবং বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে থাকিত, তাই দর্শকবৃন্দ তাহাদিগকে জাগ্রত মনে করিতে বাধ্য হইত।

এই ব্যাখ্যাটি পূর্ববর্তী দলের ব্যাখ্যা হইতেও দুর্বল ও সঙ্গতিহীন। প্রথমত, পার্শ্ব পরিবর্তন দ্বারা জাগ্রত বুঝাইবার কোন কারণ নাই। কেননা, গভীর নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিও পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, পার্শ্ব পরিবর্তনের ব্যাপারটি মাঝে মাঝে ঘটে। এমন তো হইতে পারে না যে, প্রতি মুহূর্তেই তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিল। তাই যখন কোন আগন্তক সেখানে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে দেখিত, তখনই তাহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে দেখিতে পাইত এবং মনে করিত তাহারা জাগ্রত।

মজার ব্যাপার এই, উপরোক্ত আয়াতে অনুরূপ ব্যাখ্যাকারগণই আমাদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে, এক দলের মতে তাহারা বৎসরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করে, কাহারও মতে একবার, আবার কেহ কেহ তিন বৎসরে একবার এবং একদল নয় বৎসরে একবার পার্শ্ব পরিবর্তনের কথাও বলিয়াছেন।

মুলত উপরোক্ত গবেষকগণ কোরআন পাকে উক্ত আয়াতকে কিভাবে ও কোন অবস্থায় পেশ করা হইয়াছে, সে-দিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। কোরআন পাকে বলা হইয়াছে ঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

[যদি তুমি তাহাদিগকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে পিছনে ফিরিয়া উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে। (কেননা) তাহাদের সেই ভয়াবহ দৃশ্য তোমাকে ভীত ও কম্পিত করিবে।]

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভিতরে আসহাবে কাহাফের দেহগুলি অত্যন্ত ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। যখনই কোন আগন্তুক বাহির হইতে উহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রয়াসী হইত, তৎক্ষণাৎ সে সেই ভয়াবহ দৃশ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও প্রকম্পিত হইত। যে জন্য তাহাকে শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বশ্বাসে পশ্চাদ্দিকে পলায়ন করিতে হইত।

এক্ষণে বুঝিবার বিষয় এই, যদি গুহার ভিতরকার অবস্থা এই হইত যে, কতিপয় ব্যক্তি তথায় চক্ষু খোলা অবস্থায় শায়িত রহিয়াছে, তাহা হইলে ভয়ে উর্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে হইতনা। কারণ, যে ব্যক্তি বাহির হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া গুহার অন্ধকারে সেই দৃশ্য দেখিতে প্রয়াসী হইত, তাহার দৃষ্টিশক্তি কি এতই প্রখর যে, প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাদের চক্ষুগুলি দেখিয়া ফেলিত এবং তাহাও আবার সেই অবস্থায় দেখিত, যখন তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইত?

ভ্রান্তি নিরসন ঃ মূলত সম্পূর্ণ ঘটনাটিই অন্যরূপ। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত ব্যাখ্যা-বিশারদগণের কল্পনাসৃষ্ট ধূম্রজাল হইতে মুক্ত হইয়া ব্যাপারটি সম্পর্কে গবেষণা করা না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মূল রহস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সর্বাগ্রে আয়াতে বর্ণিত অবস্থা কোন্ সময়কার তাহা বুঝিয়া লওয়া উচিত। যখন তাহারা সবেমাত্র পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়াছিল তখনকার; না আত্মপ্রকাশের পর যে শেষবারের মত গুহায় প্রবেশ করিল সেই সময়কার?

তাফসীরকারগণের ধারণা, কোরআনে বর্ণিত অবস্থা প্রথমবারেই দেখা দিয়াছিল। এখানেই তাহারা মূলত ভুল করিয়াছেন। আর এই ভ্রান্তিই তাহাদের সকল সিদ্ধান্তকে ভিত্তিহীন করিয়া দিয়াছে। আদতে, আসহাবে কাহাফের সেরূপ অবস্থা তাহাদের আত্মপ্রকাশের পরবর্তীকালে ঘটিয়াছিল। যখন তাহারা চিরতরে গুহায় ফিরিয়া গেল এবং কিছু দিন পরে দেহত্যাগ করিল, তখনই গুহার অভ্যন্তরভাগের অবস্থা অনুরূপ ভয়াবহ প্রতীয়মাণ হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে 'আয়কাজ' শব্দ দ্বারা জীবিত এবং 'রকুদ' শব্দ দ্বারা মৃত অর্থ করিতে হইবে। তদস্থলে 'জাগ্রত' এবং 'নিদ্রিত' অর্থ করিলে ভুলই করা হইবে। উক্ত শব্দদ্বয়ের প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ আরবী ভাষায় বিরল নহে।

অতঃপর বিবেচ্য এই, উক্ত ঘটনা ঈসায়ী ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক স্তরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যাঁহাদের অনুরূপ দশা ঘটিল, তাঁহারা ছিলেন ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী। শুধুমাত্র এতটুকু পটভূমিকা স্মরণ রাখিলেই সমগ্র ঘটনাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

ঈসায়ী ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক যুগেই যোগসাধনা ও সন্ন্যাসবৃত্তির এক বিশেষ জীবনধারার সূত্রপাত হইল। পরবর্তীকালে উহা বিভিন্ন ধরনের সন্ন্যাস প্রথায় রূপ লাভ করিল। উক্ত জীবন পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই সন্ন্যাসীগণ স্ব স্ব বাসভূমি ছাড়িয়া কোন পাহাড়-পর্বতে কিংবা নির্জন এলাকায় আত্মগোপনপূর্বক ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হইত। সেই সময়ে উপাসনার তন্ময়তা তাহাদের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করিত, সেই অবস্থায় যে উপাসনা শুরু করিত, সে সেই অবস্থায় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কেহ দাঁড়াইয়া উপাসনা শুরু করিত, সে সেই অবস্থায় থাকিয়াই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। তদ্রূপ যদি কেহ আজানুমস্তক হইয়া উপাসনায় তন্ময় হইত, তাহা হইলে সেই অবস্থায়ই তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইত। আবার যদি কোন সাধক মাটিতে মাথা রাখিয়া উপাসনায় নিরত হইত - তাহা হইলে সেই অবস্থায় উপাসনা করিতে করিতে সে মৃত্যুর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত। তাহাদের যোগ সাধনার ইহাই ছিল প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং মৃত্যুর পরও দর্শকগণ তাহাদিগকে জীবিত বলিয়া ভ্রম করিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে মৃত্যুর পরে আজানুমস্তক অবস্থায় দেখা যাইত। কেননা,

ঈসায়ীদের মধ্যে উপাসনা ও বিনয় প্রকাশের পদ্ধতিরূপে উহাই প্রচলিত ছিল।[১]

সেই সকল যোগী-সন্নাসী খানা-পিনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। যদি নিকটে কোন লোকালয় থাকিত, তাহা হইলে সেখানকার লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে রুটি ও পানি পৌঁছাইয়া যাইত। আর যদি তাহা না হইত, তাহারা উহার সন্ধানে কোথাও বাহির হইত না। ইবাদতে তাহারা এতই তন্ময় থাকিত যে, আহার-বিহার সম্পর্কে তাহাদের ভাবিবার ফুরসৎ কমই হইত। তাহাদের অবস্থা এইদিক দিয়া ভারতের যোগীদের চাইতে বেশী ছাড়া কম ছিল না। অদ্যাবধি ভারতে অনুরূপ যোগীর সন্ধান মিলিতেছে।

যেইভাবে জীবদ্দশায় তাহাদিগকে লইয়া কেহ ঘাঁটাঘাঁটি করিত না, তেমনি মৃত্যুর পরেও তাহাদের লাশের কাছে কেহ যাইতে সাহসী হইত না। যেই অবস্থায় তাহারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিত, বহুদিন অবধি তাহাদের লাশ সেইভাবে অবস্থান করিত। যদি মৌসুম উপযোগী থাকিত এবং হিংস্র জন্তুর কবল হইতে উহা মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে কয়েক যুগ অবধি তাহাদের আকৃতি অবিকৃত থাকিত এবং দূর হইতে প্রত্যক্ষকারী তাহাদিগকে জীবিত বলিয়া ভ্রম করিত। ভেটিকানের যাদুঘরে বহু কঙ্কাল আজিও সুরক্ষিত রহিয়াছে। যেইগুলি অনুরূপ স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং উহাদের আকৃতিও অপরিবর্তিত ছিল।

প্রারম্ভে যোগ-সাধনার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাহাড় এবং প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মনোনীত করা হইত। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতি এতই ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইল যে, অনুরূপ উদ্দেশ্য বিশেষ স্থানে বিশেষভাবে

---

১ ঈসায়ীগণ উপাসনার এই পদ্ধতিটি সম্ভবত রোমীয়গণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। কেননা, ইয়াহুদীগণের নামাযের পদ্ধতি অনুরূপ ছিল না। তাহাদের উপাসনার আনত (রুকু) হওয়ার পদ্ধতি আমাদের রুকুর ন্যায়ই ছিল।

দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি উপাসনা ও বিনয় প্রকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিত। রোমীয়গণ বাদশাহের দরবারে বিনয় প্রকাশের জন্য হাঁটু ভাঙ্গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িত এবং তাঁহার পদদ্বয়ের অথবা বস্ত্র-প্রান্তে চুম্বন দান করিত। তাহাদের অপরাধীদের জন্যও এই ব্যবস্থা ছিল যে, বিচারকের সিদ্ধান্ত তাহারা আজানু মস্তক হইয়া শ্রবণ করিত। মিসর, ব্যাবিলন ও ইরানে সেজদার পদ্ধতি চালু ছিল। ভারতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিবার পদ্ধতি ছিল।

আসহাবে কাহাফ

অট্টালিকা তৈরী করা হইত। সেই দালান গুলিতে কোন দ্বার রাখা হইত না। কারণ, উহাতে যে প্রবেশ করিত, সে আর কখনও বাহির হইত না। তাহার জন্য শুধু একটি সংকীর্ণ ছিদ্র-বিশিষ্ট জানালা রাখা হইত এবং সেই ছিদ্রপথে আলো-বাতাস যাতায়াত করিত। বাহির হইতে জনসাধারণ সেই সংকীর্ণ জানালা পথে তাহার জন্য আহার্য পৌঁছাইয়া দিত।

পরবর্তীকালে সন্ন্যাসব্রতের জন্য যথারীতি সংস্থা গড়িয়া তোলা হইল। তখন হইতে উক্তরূপ ব্যক্তিগত যোগসাধনার পদ্ধতি হ্রাস পাইয়া চলিল। এতদসত্ত্বেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মধ্যযুগ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং ইউরোপের কোন এলাকা এরূপ ছিল না যেখানে অনুরূপ অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হইত না। সেই সকল স্থানকে সাধারণত Lo-gette বলা হইত। যখনই কোন সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী উহার ভিতরে মৃত্যুবরণ করিত তখন উহার উপর ল্যাটিন ভাষায় লেখা হইত Tu-ora অর্থাৎ উহার জন্য দোয়া কর।

ইতিহাসকারদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে জানা যায়, ঈসায়ী ধর্মের সন্ন্যাসপ্রথা প্রাচ্যদেশেই প্রথম আরম্ভ হয় এবং উহার কেন্দ্র ছিল প্যালেস্টাইন ও মিসর। অতঃপর চতুর্দশ শতকে উহা ইউরোপে প্রসার লাভ করে। সেন্ট বেনিডিক্ট সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সেন্ট বেনেডিক্ট নিজেও এক পাহাড়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

ঈসায়ী সন্ন্যাসপ্রথার ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে সুস্পষ্ট জানা যায়, উহার সূত্রপাত অত্যাচারমূলক পরিবেশেই হইয়াছিল। অবশেষে উহা স্বাভাবিক অবস্থায় অনুসৃত পদ্ধতিতে পর্যবসিত হইল। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মানুসারিগণ বিরুদ্ধবাদীদের অমানুষিক নিপীড়নে বাধ্য হওয়াই পাহাড় ও জংগলে নির্জনবাস এখতিয়ার করিয়াছিলেন। অতঃপর ক্রমে ক্রমে উহা এই পর্যায়ে উপনীত হইল যে, ধার্মিকগণ উহাকে সাধনা ও উপাসনার এক স্বাভাবিক ও পছন্দনীয় পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করিলেন।

যাহা হউক, উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়, আসহাবে কাহাফের ঘটনাও সামগ্রিকভাবে অনুরূপ ব্যাপার ছিল বৈ নহে। প্রথমে তাহাদের জাতি তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য। অতঃপর যখন তাহারা তথায় কিছুকাল

অবস্থান করিল, তখন সাধনা উপাসনার এমন এক মোহ তাহাদিগকে পাইয়া বসিল যে, আর কিছুতেই তাহারা লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতে রাজী হইল না। যদিও দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা গুহায় থাকিয়া উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন থাকাটাকেই পছন্দনীয় ভাবিল এবং সেই অবস্থায় তাহারা মৃত্যুবরণ করিল। তাহাদের যেই ব্যক্তি যে অবস্থায় উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন ছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহাদের প্রভুভক্ত কুকুরটিও তাহাদের সংগ ত্যাগ করিল না। পাহারা দানের উদ্দেশ্যে গুহার দ্বারদেশে অবস্থান করিল। প্রভুগণ মৃত্যুবরণ করিলে সেটিও সেই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে আলিংগন করিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে স্বভাবতই গুহার অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল। যদি কেহ বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর ভাগের দিকে ঝুঁকিয়া পরিয়া দেখিতে প্রয়াসী হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত একদল সাধু-সন্ন্যাসী উপাসনা ও ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে। কেহ আনতজানু হইয়া রুকুর অবস্থায় রহিয়াছে, কেহ সেজদায় পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ হাতজোড় করিয়া উর্ধপানে তাকাইয়া রহিয়াছে ইত্যাদি। আরও দেখিতে পাইত, গুহার দ্বারদেশে একটি কুকুর সম্মুখে পা দুইটি বিছাইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এহেন অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া মানুষের পক্ষে ত্রাসে প্রকম্পিত হওয়া আদৌ বিচিত্র ব্যাপার নহে। কেননা, মানুষতো সেখানে মৃতদেহ দেখিবার জন্য আসিত ; কিন্তু তাহারা তদস্থলে দেখিতে পাইত একদল জীবন্ত উপাসক।

(চ) উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে সমগ্র ঘটনাটি লক্ষ্য করিলেই প্রত্যেকটি দিক এরূপ উজ্জল হইয়া উঠিবে, মনে হইবে যেন সমগ্র রহস্যের তালাগুলি কেবলমাত্র একটি চাবির অপেক্ষায় ছিল। এক্ষণে মৃতকে জীবিত মনে করিবার তাৎপর্যও যথাযথভাবে হৃদয়ংগম হইবে। তজ্জন্য টালবাহানার ব্যাখ্যা সন্ধান করিয়া বেড়াইতে হইবে না। অনুরূপ দৃশ্য অবশ্যই দর্শকের প্রথম দর্শনে মনে তাহাদের জীবিত থাকার ধারণা সৃষ্টি করিবে ; যদিও তাহারা আদৌ জীবিত নহে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে দেখামাত্র ভীত হওয়ার কারণও এখন সুস্পষ্ট হইবে। তজ্জন্য যত নিরর্থক ও ভিত্তিহীন বিশ্লেষণের অনুসরণ করা হইয়াছিল, তাহাও এখন আর প্রয়োজন হইবেনা। এমন কি ইমাম রাযীও যে-সব গোঁজামিলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন, তাহাও এখন নিষ্প্রয়োজন মনে হইবে।

ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনি কোন কবরে ঝুঁকিয়া একটি মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পান, সে নামাজে নিরত রহিয়াছে, তখন আপনার অবস্থা কি দাঁড়াইবে? নিশ্চয়ই তখন আপনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিবেন।

অতঃপর তাহাদের পার্শ্ব পরিবর্তনের তাৎপর্যও এখন বুঝিতে কষ্ট হইবে না। কেননা, পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুহার প্রবেশ পথ উত্তর দিকে এবং নিষ্ক্রমণ পথ দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। ফলে উত্তর-দক্ষিণের হাওয়া গুহার ভিতর দিয়া যথারীতি যাতায়াত করে। সে-ক্ষেত্রে শীতের হাওয়া সেই কংকালগুলিকে বাম দিকে ফিরিয়া রাখিলে আবার দক্ষিণের হাওয়া সেগুলিকে ডাইনে ফিরিয়া রাখিত। কখনও আবার বিভিন্নমুখী হাওয়া সেগুলিকে স্বল্পকালীন ব্যবধানে ডাইনে ও বামে ফিরাইতে থাকিত। যাহাতে মনে হইত, কোন জীবিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দিক্ পরিবর্তন করিতেছিল।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরে এই প্রশ্নের জওয়াবও সহজে পাওয়া যাইবে যে, আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে বিশেষভাবে পাহাড়ের গুহায় সূর্যকিরণ প্রবেশ না করার ব্যাপারটি কি কারণে উল্লেখ করিলেন এবং উহাকে আল্লাহতায়ালার এক বিশেষ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিবার রহস্যই বা কি হইতে পারে?

সপ্তদশ আয়াতের উক্ত বর্ণনা অষ্টাদশ আয়াতের ভূমিকা বৈ নহে। যেহেতু পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে, মৃত্যুর পরেও তাহাদের লাশগুলি দীর্ঘদিন অবিকৃত ছিল এবং দর্শকদের জীবিত বলিয়া ভ্রম হইত। তাই পূর্ব আয়াতেই উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য বলা হইল যে গুহায় তাহারা ধ্যানমগ্ন ছিল, তথায় মৃতদেহ দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকিবার মত পরিবেশও রহিয়াছে। সূর্যরশ্মি সে স্থান উত্তপ্ত করিতে পারে না, অথচ আলো-বাতাস তথায় যথারীতি বিদ্যমান। ফলে, মৃতদেহগুলিকে পচাইয়া গলাইয়া ফেলিবার মত তাপ তথায় ছিল না। পক্ষান্তরে, উহাকে তাজা রাখিবার মত আলো-বাতাস সেখানে অহরহ যাতায়াত করিত। ইহাই আল্লাহতায়ালার নিদর্শন।

ছ) প্রশ্ন জাগে, সেক্ষেত্রে সূরার পঞ্চবিংশ আয়াতের অর্থ কি? উহাতে বলা হইয়াছে:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

(তাহারা পর্বত গহ্বরে তিনশত বৎসর কিংবা নয়শত বৎসর ছিল)

ইহা কি স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের তরফের বর্ণনা নহে? এই প্রশ্নের জওয়াবে বলা যাইতে পারে, যদি উহা খোদার তরফের বর্ণনাই হইত, তাহা হইলে সংগে সংগে তিনি আবার قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا (আপনি বলুন যে, তাহাদের অবস্থান-কাল সম্পর্কে আল্লাহতায়ালাই অধিক জ্ঞান) বলিলেন কেন?

তাফসীরকারগণ ইহার জওয়াব দান করিতে গিয়া বিভিন্নরূপ হাস্যকর প্রয়াস পাইয়াছেন। মূলত ইহার পরিষ্কার অর্থ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সেখানে অবস্থানকারীদের সম্পর্কিত সংখ্যা বিভিন্ন মতামতকে আল্লাহ্ পাক যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্রূপ তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কিত মানবীয় ধারণাটিরও তিনি উল্লেখ করিলেন। অর্থাৎ মানুষের ধারণা যে তাহারা তথায় তিনশত বৎসর ছিল কেহ কেহ তাহাদের অবস্থান কালকে নয়শত বৎসর পর্যন্ত বলিয়া বেড়ায়। (হে মোহাম্মদ সঃ আপনি বলিয়া দিন, মূলত তাহারা তথায় কত বৎসর ছিল তাহা খোদাই অধিক জানেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত অবস্থান কাল মানুষের ধারণা মাত্র এবং 'যথাশীঘ্র তাহারা বলিবে'' হইতে যে আলোচনা শুরু করা হইয়াছে, উহা তাহারই শেষ গাঁথুনি। হযরত আবদুল্লা এবনে মাসউদও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী হযরত এবনে আব্বাসের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে।

اُولٰئِكَ قَوْمٌ فَنُوْا وَعُدِمُوْا مُنْذُ مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ ○

অর্থাৎ—আসহাবেকাহাফের মৃত্যু বহুদিনপূর্বেই ঘটিয়াছেএবং তাহাদের দেহাবলীও ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এক রেওয়াতে (বর্ণনায়) জানা যায়, সিরিয়ার যুদ্ধের সময় কতিপয় সাহাবা আসহাবে কাহাফের গুহায় পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাহাদের কংকাল দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই বর্ণনা অনুসারে আসহাবে কাহাফের ঘটনা যে পেট্রায় ঘটিয়াছিল, তাহাও প্রমাণিত হইল।

ঈসায়ীদের সন্ন্যাস প্রথা সম্পর্কে উপরে যে সকল ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে নিম্নের গ্রন্থ কয়টি পাঠ করা উচিত।*

The Paradise of Garden of the Holy Fathers by E- A. W. Budge-
The Evolution of Monastiol deal by H, Workman,
Five Genturies of Religion by G. C. Gou
The Medievai Mind by H. D, Taylor,

জুলকারনায়েন

জুলকারনায়েন প্রসংগ

কোরআন শরীফের 'সূরায়ে কাহাফে' বর্ণিত তৃতীয় ঘটনাটি হইল জুলকার-নায়েন সম্পর্কিত। মক্কার জনসাধারণ সে সম্পর্কে রসূলে খোদার সঃ নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল। সকল তাফসীরকার এ ব্যাপারে একমত যে, প্রশ্নটি ইয়াহুদীদের তরফ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল।

কোরআন শরীফে জুলকারনায়েন সম্পর্কে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার উপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করিলে নিম্নের ব্যাপার কয়টি প্রতিভাত হয়।

প্রথম, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তিনি ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে জুলকারনায়েন নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ 'জুলকারনায়েন' উপাধি স্বয়ং আল্লাহ পাক তাহাকে দান করেন নাই বরং উহা প্রশ্নকারীদেরই প্রস্তাবিত উপাধি। যেমন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ

(অতঃপর তাহারা আপনাকে জুলকারনায়েন সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে।)

দ্বিতীয়, আল্লাহতায়ালা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহে শাসন ক্ষমতা দান করিয়া সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করিয়াছেন।

তৃতীয়, তাহার বৃহত্তম অভিযান ছিল তিনটি। প্রথমে তিনি পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করেন, তৎপরে পূর্বাঞ্চল জয় করেন এবং সর্বশেষে এক পার্বত্য এলাকা জয় করিতে করিতে অগ্রসর হন। সেই পাহাড়ের অপর পার্শ্ব হইতেই ইয়াজুজ-মাজুজগণ আসিয়া লুটতরাজ করিত।

চতুর্থ, সেখানে তিনি এরূপ সুদৃঢ় একটি দেয়াল তৈরী করিলেন যাহার ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজের পথ বন্ধ হইয়া গেল।

পঞ্চম, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের দেশসমূহ জয় করিতে করিতে এমন জাতির সম্মুখীন হইলেন, যাহারা তাঁহাকে অন্যান্য দিগ্বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী ভাবিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দেশ জয় করিয়া জুলকারনায়েন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন, নিরপরাধ ও নিরীহ জনসাধারণের কোন ভয়ের কারণ নাই। যাহারা ন্যায় ও সত্যপথ অনুসরণ করিবে, তাহারা পুরস্কৃত হইবে। অবশ্য যাহারা অন্যায় ও অসৎকার্য করিবে, তাহাদের মনে ভয় রাখা উচিত।

ষষ্ঠ, জুলকারনায়েন খোদাভক্ত ও সত্যভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি পরকালের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন।

সপ্তম, তিনি স্বার্থান্বেষী সম্রাটদের ন্যায় কোন প্রকারের লোভ-লালসার বশীভূত ছিলেন না। একদা এক সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানাইল, "ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় আমাদের উপর বারংবার আক্রমণ চালাইতেছে। আপনি আমাদের ও তাহাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিন। আমরা কর দান করিয়া আপনার ঋণ শোধ করিব।" তিনি জওয়াব দিলেন: খোদা যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন, উহাই উত্তম ও যথেষ্ট। তোমাদের রাজস্বের প্রতি আমার আদৌ লোভ নাই। আমি অর্থের লোভে তোমাদের এই কাজ করিব না। আমি স্বীয় কর্তব্য হিসাবেই ইহা করিয়া যাইব।

এখন কথা হইল, প্রাচীন নৃপতিগণের যাহার ভিতরে এই সকল গুণ ও কার্যাবলী পাওয়া যাইবে, তিনিই জুলকারনায়েন হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কে?

প্রথমে তাঁহার 'উপাধি' সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। কেননা তাফসীরকারগণ ইহা লইয়াই সর্বপ্রথম বিভ্রাট ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছেন। আরবী এবং হিব্রু উভয় ভাষারই 'কারন' অর্থ শিং। তাই জুলকারনায়েন অর্থ 'দুই শিং বিশিষ্ট'। অথচ ইতিহাসে এই উপাধি বিশিষ্ট কোন সম্রাট বা নৃপতির সন্ধান মিলিতেছে না। এই জন্যই ব্যাখ্যাকারগণ বাধ্য হইয়া 'শব্দের' অর্থ লইয়া বিভিন্নরূপ টানা হেঁচড়া করিয়াছেন।

অতঃপর পরবর্তী যুগের তাফসীরকারগণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট হিসাবে গ্রীসের শাহ সিকান্দারকে (আলেকজাণ্ডার) দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই

উক্ত উপাধিতে ভূষিত করিলেন। এমন কি ইমাম রাযীও তাঁহাকে জুলকারনায়েন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইমাম রাযীর স্বভাব হইল এই, তিনি কোন প্রসংগে আলোচনা করিতে গেলে উহার পক্ষ ও বিপক্ষের সকল ধরনের যুক্তি উপস্থিত করিয়া নিজে এক এক করিয়া উহার বিচার করিতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিয়া ক্ষান্ত হইতেন। এখানেও তিনি সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী নিজেই উত্থাপন করিয়া স্বীয় জ্ঞানানুসারে সেগুলির নির্দেশ ও সমাধান দান করিয়াছেন। অথচ কারআনে বর্ণিত জুলকারনায়েনের গুণাবলী শাহ সিকান্দরের ভিতরে আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেননা, শাহ সিকান্দর খোদাভক্ত, ন্যায়-পরায়ণ, দয়ালু ও নির্লোভ ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি কোন প্রাচীর নির্মাণ করেন নাই।

মোটকথা, তাফসীরকারগণ অদ্যাবধি জুলকারনায়েনের সন্ধান পান নাই।

দানিয়েল নবীর সন্ধান

জুলকারনায়েনের সঠিক পরিচয় লাভের একমাত্র উপায় ছিল দানিয়েল নবীর গ্রন্থ অধ্যয়ন। ব্যাবিলনের অবরোধকালীন অবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, উহাতে জুলকারনায়েনের যথাযথ পরিচয় মিলে।

ব্যাবিলনের অবরোধকালীন অবস্থাটি ইয়াহুদীদের জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়ের সময় ছিল। উহার ফলে তাহারা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের উপাসনালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তাহাদের শহর উজাড় হইয়া গেল। তাহারা এই বিপর্যয়ের পরে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িল। এরূপ মুহূর্তে হযরত দানিয়েল (আঃ) আবির্ভূত হন। তিনি স্বীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের বদৌলতে ব্যাবিলনের বাদশাহের দরবারে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইলেন। এইজন্যই তাঁহাকে তৌরাতে 'বিলাসফার' বলা হইয়াছে। এই বাদশার শাসনকালের তৃতীয় বর্ষে তিনি এক স্বপ্ন দেখিলেন। উক্ত স্বপ্নে তাঁহাকে আগামী দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে সুসংবাদ দান করা হইয়াছিল। স্বপ্নটি নিম্নরূপ ছিল :

"আমি দেখিলাম : নদীর তীরে একটি ভেড়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উহার দুইটি উঁচু শিং দেখা যাইতেছিল। একটি হইতে অপরটি পশ্চাতে ছিল এবং অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল। আমি দেখিলাম : ভেড়াটি উত্তর-দক্ষিণ ও

পশ্চিম দিকের শিং দ্বারা আঘাত করিতেছে। সেই আঘাতের প্রচণ্ডতা এতখানি ছিল, কোন জন্তুই উহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। এইভাবে ইহার শিং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া বেশ বড় হইয়া গেল। আমি এই অবাক কাণ্ড সম্পর্কে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, পশ্চিম দিক হইতে একটি ছাগল বাহির হইয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া চলিল। উহার দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে আশ্চর্য ধরনের একটি শিং দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে ছাগলটি এই দুই শিং বিশিষ্ট ভেড়ার নিকট উপস্থিত হইল এবং ভীষণ বেগে উহার উপর আপতিত হইল। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেড়াটির শিং দুইটি ভাঙ্গিয়া গেল এবং ছাগলটির সহিত উহার আর লড়িবার ক্ষমতা রহিল না।"

এই স্বপ্নের পরেই হযরত জিবরাঈল (আঃ) দেখা দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলিলেন : দুই শিং বিশিষ্ট ভেড়া মেডিয়া ও ইরানের সম্মিলিত সাম্রাজ্য এবং লোম বিশিষ্ট ছাগলটি গ্রীসের অধিপতি। আর দুই চক্ষুর মধ্যস্থলে যে শিং দেখা গিয়াছে উহার তাৎপর্য এই, গ্রীসের প্রথম বীর অধিপতির অনুরূপ চিহ্ন থাকিবে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, মেডিয়া ও ইরান রাজ্য দুইটিকে দুই শিং-এর সহিত তুলনা দান করা হইয়াছে এবং যেহেতু এই দুইটি রাজ্য মিলিয়া একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য উহার প্রথম সম্রাটকে দুই শিং বিশিষ্ট ভেড়ারূপে দেখান হইল এবং সেই ভেড়াটিকে পরাজিত করিবে গ্রীসের দিগ্বিজয়ী ছাগল অর্থাৎ মহাবীর আলেকজাণ্ডার। বস্তুত, আলেকজাণ্ডার ইরান আক্রমণ করিয়া কিয়ানী সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।

স্বপ্নের ভিতরে বনী ইসরাঈলদের জন্য এই সুসংবাদ নিহিত ছিল যে, তাহাদের মুক্তি ও শান্তি নূতন অধ্যায়ের সূচনা উক্ত দুই শিং বিশিষ্ট সম্রাটের আবির্ভাবের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ইরান সম্রাটই ব্যাবিলন আক্রমণ করিয়া জয় করিবেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবেন। ফলে, ইয়াহুদী সম্প্রদায় পুনর্বার তাহাদের সংহতি ও শক্তি ফিরিয়া পাইবে।

বস্তুত, উহার কয়েক বৎসর পরেই সম্রাট সাইরাসের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ইরান ও মেডিয়া রাজ্যদ্বয়কে মিলাইয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া

তুলিলেন। অতঃপর উপর্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ চালাইয়া তিনি ব্যাবিলন দখল করিয়া লইলেন।

যেহেতু উক্ত স্বপ্নের মেডিয়া ও ইরান দেশকে দুইটি শিং-এর সহিত তুলনা দান করা হইয়াছে, তাই এ ধারণা বিচিত্র নহে যে, পারস্যের সেই সম্রাটের ইয়াহুদীগণ জুলকারনায়েন আখ্যা দান করিয়াছিল। তবুও উহা ছিল ধারণা মাত্র এবং উহার সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য মিলিতেছিল না।

কিন্তু ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে জানা গেল, উক্ত ধারণার পিছনে ঐতিহাসিক সত্যও রহিয়াছে এবং মূলতঃ সম্রাট সাইরাসই জুলকারনায়েন নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উহাতে আরও প্রমাণিত হইল, জুলকারনায়েন উপাধি ইয়াহুদীদের ধর্মীয় খেয়াল প্রসূতই ছিল না, বরং সাইরাস বা ইরানবাসীদের পছন্দনীয় খেতাব উহাই ছিল।

উক্ত আবিষ্কারের ফলে এই ব্যাপার সম্পর্কিত সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়াছে। সাইরাসের এক প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা Pasargadae-এর ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। উহাতে সাইরাসের দেহাকৃতি এরূপভাবে দেখান হইয়াছে যে, তাহার দুই-দিকে শকুনের ন্যায় দুইটি পাখা ছিল এবং মস্তকের উপরে ভেড়ার ন্যায় দুইটি শিং ছিল। উপরে থাকা লাইনে যে শিলালিপি খোদিত ছিল উহার অধিকাংশই ভাংগিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। তবুও যতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাই প্রতিমূর্তির সম্যক পরিচয় লাভের জন্য যথেষ্ট। উহাতে জানা গেল যে, মেডিয়া ও ইরান রাজ্যদ্বয়কে দুই শিং-এর সহিত তুলনা দানের ধারণাটি ব্যাপক ও জনপ্রিয় ছিল এবং নিঃসন্দেহে সাইরাসকেই 'জুলকারনায়েন' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। প্রতিকৃতিতে পাখা ও পালক তাহার ঐশ্বরিক গুণাবলী ও মর্যাদার প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। কেননা, শুধু পারস্যেই নহে বরং তৎকালীন সকল জাতির এই ধারণা ছিল যে, তিনি অতিমানব ছিলেন।

দুই শিং-এর কল্পনা সর্বপ্রথম কিভাবে সৃষ্টি হইল? উহার বুনিয়াদ কি দানিয়াল নবীর স্বপ্ন ছিল, না সাইরাস কিংবা তাহার দেশবাসী এই

খেতাব পছন্দ করিয়াছিল? এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু তৌরাতের অভিমত মানিয়া লইলে দেখা যায়, সাইরাস হইতে প্রথম আর্টাযেরাকসিজ[1] পর্যন্ত সকল ইরানী সম্রাটই বনী ইসরাঈলের কোন না কোন নবীর অনুসারী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই নবীর স্বপ্নের মাধ্যমে সাইরাস 'জুলকারনায়েন' খেতাব লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এ ব্যাপারে এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে, জুলকারনায়েন বলিতে 'সাইরাস'কেই বুঝান হইয়াছে এবং আরবের ইয়াহুদীগণ তাহাকেই উক্ত নামে অভিহিত করিত।

এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে যখন 'সাইরাসের' ইতিহাস গ্রীক ইতিহাস বেত্তাদের মুখে শোনা যায়, তখন দেখা যায় যে, কোরআনের উল্লেখিত জুলকারনায়েনের কার্যাবলী এবং 'সাইরাসের' কার্যাবলী হুবহু মিলিয়া যায়। উভয় বর্ণনার ভিতরে এতখানি সামঞ্জস্য বিদ্যমান যে, তদ্বারা উভয়কে এক না ভাবিয়া গত্যন্তর থাকে না।

আধুনিক যুগের অনুসন্ধিৎসু ইতিহাসকারগণ পারস্যের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায় হইল আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ

---

১ জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পারস্য সম্রাটদের নাম বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই ইতিহাসকারগণ অনেকক্ষেত্রে মারাত্মক ভ্রান্তিতে পতিত হন। 'সাইরাসে'র মূল নাম গৌরু বা গৌরশ ছিল। দারায়ুসের শিলালিপিতে অনুরূপ নাম পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রীকগণ তাহাকে সাইরাস নামে অভিহিত করে। ইয়াহুদীগণ হিব্রু ভাষায় উহাকে 'খোরস' উচ্চারণ দান করিলে তদনুসারে ইয়াসীয়া, ইয়ারমিয়া ও দানিয়েলের গ্রন্থসমূহে উক্ত নামের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই গোরেশই আরবী ভাষায় 'ইসরু' রূপ ধারণ করিয়াছে। তদনুসারে আরব ইতিহাস বেত্তাদের ভাষায় তৎকালীন পারস্য সম্রাটগণ 'কায়-ইসরু' উপাধিতে ভূষিত হন।

সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বিসেজ নামে পরিচিত। ইহাও গ্রীক উচ্চারণ। তাহার নাম ফার্সী ভাষায় ছিল কাবুজিয়া। হিব্রু ও আরবী ভাষায় তাহাকেই বলা হয় কায়কোবাদ। ফেরদৌসীর শাহনামায় এর নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা শাহনামা আরবদের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। কায়কোবাদের পরে দারায়ুস সম্রাট হন। সাধারণতঃ তিনি দারা নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন। তৌরাতেও এই নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। দারার পরে আর্টাযেরকসিস সিংহাসনে আরোহন করেন। তৌরাতে তাহাকে আর্তাখশিশ্‌ত নাম দেওয়া হইয়াছে। আরবদের ভিতরে তিনি 'আদশীর' নামে পরিচিত।

পূর্বকাল, দ্বিতীয় অধ্যায় পার্থীয়-শাসনকাল এবং তৃতীয় অধ্যায় দ্বারা সাসানীয় শাসনকাল বুঝায়।

ইরান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পূর্বকালকেই বলা হয় এবং উহা সম্রাট 'সাইরাসের' উত্থানকাল হইতে শুরু হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের যুগ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিবার উপকরণাদি প্রায়ই কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। আরবরা সে সম্পর্কে যতটুকু জানিতে পারে, তাহা গ্রীক ইতিহাসকারদের মাধ্যমেই। তন্মধ্যে তিনজন ইতিহাসবেত্তাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তাহারা হইলেন হিরোডোটাস, টিসিয়াজ ও যিনোফোন।

ইরান বিজয়ের পরে আরবগণ যখন ইরানের ইতিহাস লিখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন তাহারা যে সকল উপায় ও উপকরণের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তন্মধ্যে পার্সিয়ানদের বর্ণনাই অধিকতর সহায়ক হইয়াছিল। সেই সব বর্ণনায় সিকান্দার আজমের (আলেকজাণ্ডার) আক্রমণ-পূর্ব-কালের ঘটনাবলী এরূপ রূপকাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল, যেরূপ ভারতে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্য উহার পরবর্তী দুই কালের ইতিহাস অনেকটা নির্ভরশীল তথ্যের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দাকিকী ও ফেরদৌসী যখন শাহনামা রচনা করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন তাহাদের সম্মুখে আরব ইতিহাসকারগণের রচিত ইতিহাস বিদ্যমান ছিল এবং তাহারা উহা হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থাবলী 'সিকান্দরে আযমের আক্রমণ-পূর্বকালের ব্যাপারে বিশেষ ফলপ্রসূ নহে। তাই 'সাইরাস' সম্পর্কে জ্ঞাত হইবার জন্য আমাদিগকে অনেকটা ইতিহাসকারগণের উপর নির্ভর করিতে হয়।

হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বৎসর (খৃঃ পূঃ ৫৬০) পূর্বে ইরান সাম্রাজ্য দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণাংশকে বলা হইত পারস্য এবং উত্তর-পশ্চিম অংশকে মেডিয়া[১]। যেহেতু উহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র-

১ সম্রাট দারায়ুসের শিলালিপিতে মেডিয়াকে 'মার্দা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং মেডিয়া গ্রীক উচ্চারণ বই নহে। আরব ইতিহাসকারগণ উহাকেই 'মাহাত' নাম দিয়াছেন।

হিসাবে আশুরী এবং ব্যাবিলন রাজ্যদ্বয় চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই রাজ্যদ্বয় বিশেষ দীন-হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। উভয় রাজ্যে বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ নিজ নিজ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার কায়েম করিয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ৬১২ অব্দে নিনুয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল এবং আশুরীয় শাসন চিরতরে লুপ্ত হইল, তখন মেডিয়ার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা লাভ করিল এবং ধীরে ধীরে একটি জাতীয় সরকার গড়িয়া তুলিল। এইভাবে পারস্যের বিভিন্ন গোত্রীয় সর্দারদের কেহ কেহ উন্নতি লাভ করিল, এমন কি একটি রাজ্য গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা অর্জন করিল। এতদ্‌সত্বেও উভয় রাজ্যে অনেক ক্ষুদ্র ও দুর্বল সরকারের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বখ্‌তে নাসারার মত অত্যাচারী সম্রাটের কবলে অন্যান্য দেশের ন্যায় এই দেশ দুইটিও নিপতিত হইয়াছিল।

সাইরাসের আবির্ভাব

খৃঃ পূঃ ৫৫৯ অব্দে এক অসাধারণ ব্যক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া আবির্ভূত হন। ফলে, সহজেই সমগ্র দুনিয়ার তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তিনিই পারস্যের একেমিনিস[১] রাজবংশোদ্ভূত তরুণ সম্রাট খোরেশ। তাঁহাকে গ্রীকগণ 'সাইরাস', ইরানীগণ 'খোরেস' এবং আরবগণ 'কায়-খসরু' নামে অভিহিত করেন। তাঁহাকেই প্রথমে পারস্যের আমীরগণ সমবেতভাবে সম্রাটরূপে স্বীকৃতি দান করিলেন। অতঃপর বিনা রক্তপাতে তিনি মেডিয়া করতলগত করেন। এইভাবে উভয় রাজ্য মিলিয়া বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইল।

অতঃপর তাঁহার দিগ্বিজয়ের পালা শুরু হইল। তাঁহার এই দিগ্বিজয় অন্যান্য অত্যাচারী ও দুর্ধর্ষ নৃপতিদের ন্যায় রক্তারক্তির মাধ্যমে হয় নাই; বরং উহা মানবতা ও ন্যায়পরায়ণতার জয়যাত্রা ছিল। সাধারণতঃ তাঁহার অভিযান নিপীড়িত ও পর্যুদস্ত জাতির সহায়তার জন্য পরিচালিত হইত। তাই মাত্র বার বৎসরের ভিতর কৃষ্ণসাগর হইতে সুদূর বলখ শহর পর্যন্ত এশিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড তাঁহার পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জগতের সকল অসাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সাইরাসের প্রথম জীবনও এক রোমাঞ্চকর রূপকথার নায়কের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়াছিল। শাহনামার কাহিনীতে আমরা উহারই কিছুটা বর্ণনাচ্ছটা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তাঁহার উত্থান স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতির ধারা বাহিয়া সম্ভবপর হয় নাই; বরং এমন সব অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক অবস্থার ভিতর দিয়া তিনি আবির্ভূত হন, যাহা মানব জাতির ইতিহাসে কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুত, ইহা স্রষ্টার এক অস্বাভাবিক লীলা বটে।

তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার মাতামহ আস্টাগিস তাঁহার মৃত্যুর ব্যবস্থা

---

১ দারা শিলালিপিতে স্বীয় বংশ তালিকার শীর্ষে হেখামনিস নামক সম্রাটের উল্লেখ করিয়াছেন। এই হেখামনিসই গ্রীক ভাষায় একিমিনিস নামে পরিচিত। হিরো-ডোটাসের বর্ণনামতে তিনি সম্রাট সাইরাসের প্রপিতামহ ছিলেন। অর্থাৎ একিমিনিসের পুত্র টিসপিস, তৎপুত্র কেম্বুচিয়া (কায়কোবাদ) এবং তৎপুত্র সাইরাস ক্রমাগত সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম অনুসারে স্বীয় পুত্রের নাম কেম্বিসিস রাখিয়াছিলেন।

সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেই ব্যবস্থা হইতে আশ্চর্যজনক উপায়ে রক্ষা পাইলেন। তাহার প্রথম জীবন বনে-জংগলে ও পাহাড়-পর্বতে অতিবাহিত হইল। অতঃপর এমন একদিন আসিল যখন তিনি লোকালয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন, অনুপম চরিত্রবান ও চমৎকার স্বভাবের লোক হিসাবে খ্যাতিলাভ করিলেন। এমন কি ক্রমে তাহার বংশ-পরিচিতিও প্রকাশ হইয়া পড়িল। ফলে জনসাধারণ তাহার পূর্ণ সমর্থক হইল এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিল। সাইরাস এক্ষণে শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ পাইলেন। কিন্তু, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কল্পনাও তাঁহার মহান অন্তরে ঠাঁই পায় নাই। এমন কি তাঁহার প্রধান শত্রু ও মাতামহ আষ্টাগিসকেও তিনি স্বদায়িত্বে নিরাপত্তা দান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম লিডিয়ার (উঃ পঃ এশিয়া মাইনর) বাদশাহ্ ক্রোয়েসাসের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সকল ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত, ক্রোয়েসাসই প্রথম সাইরাসের সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালাইয়া তাহাকে দেশরক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। লিডিয়া এশিয়ার বুকে গ্রীক সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্র ছিল। উহার শাসন ব্যবস্থাও এক পদ্ধতিতে চলিত। সেই যুদ্ধে সাইরাস জয়ী হইলেন। কিন্তু সেখানকার প্রজাবর্গের সহিত তিনি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। এমন কি তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে, দেশে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অবশ্য বন্দী ক্রোয়েসাস সম্পর্কে গ্রীক ইতিহাসবেত্তাগনের বর্ণনায় দেখা যায়, সাইরাস তাহাকে পরীক্ষামূলকভাবে চিতায় জীবন্ত-দগ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোয়েসাস যখন নির্ভিকভাবে সেই চিতায় আরোহন করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন সাইরাস তাহার মনোবলে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ক্ষমা করেন এবং অবশিষ্ট জীবন তাহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দেওয়া হয়।

এই যুদ্ধের পর তাহাকে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইল, কেননা, গীডারদেসা (মাকরান) ও বেকড়িয়ার (বলখ) উচ্ছৃংখল গোত্রগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। এই অভিযান খৃঃ পূঃ ৫৪৫ হইতে খৃঃ পূঃ ৫৫০ পর্যন্ত চলিতে থাকে।

প্রায় একই সময় বাবেলের (ব্যাবিলন) অধিবাসীগণ, তাহাদের অত্যাচারী শাসক বেলশাজারের[১] হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সাইরাসের নিকট দরখাস্ত করিল।

নিনুয়ার পতনের পরে বাবেলে এক নূতন রাজবংশের ভিত্তি স্থাপিত হইল এবং নবুকদনজারের (বখতে নাসার) বিভীষিকাময় অভিযানের কবলে পশ্চিম এশিয়া বিপর্যস্ত হইল। তাহার বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ ইতিহাসের এক ধ্বংসাত্মক লোমহর্ষক ঘটনা। তিনি শুধু বাদশাহ্‌গণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, বরং পরাজিত জাতিকে দাসে পরিণত করিতেন এবং বিজিত দেশের উপর অবাধ ধ্বংসলীলা চালাইয়া যাইতেন। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কেহই তাহার ন্যায় যোদ্ধা ছিল না। এমন কি তাঁহার বিজিত দেশসমূহ রক্ষা করিবার মত ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। ফলে, তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে বাবেলের গীর্জাসমূহের পাদ্রীগণ মিলিয়া নাবুনিদাসকে রাজ্যের অধিপতি করিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যের সকল কাজ-কারবার বেলশাজারের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। বেলশাজার ছিলেন অত্যাচার অনাচারের শরীরী মূর্তি। তাঁহার সম্পর্কে আমরা হযরত দানিয়েলের (আঃ) গ্রন্থে দেখি, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের পবিত্র গীর্জার পেয়ালায় শরাব পান করিয়াছিলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ এক অদৃশ্য হস্ত আবির্ভূত হইয়া গীর্জার দেওয়ালে শব্দ কয়টি লিখিয়া দিলেন।

منے منے تقتیل ا د فیرسن

(দানিয়াল ১ : ৫)

---

১ হযরত দানিয়েলের (আঃ) গ্রন্থে স্থানে স্থানে বিলশাজারকে 'বেল্লশাজার' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাবেলের শিলালিপি হইতে তাহার যে ঠিক নাম উদ্ধার করা হইয়াছে তাহা ইহাই। এতদ্ভিন্ন লিপিলিখকগণ সাইরাস এবং দারার অভিযানগুলির মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। উহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা সাইরাসের স্থলে দারা এবং দারার স্থলে সাইরাসকে আক্রমণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের ভিত্তিতে যে তথ্য জানা যায় তাহা হইল এই যে, বাবেলের উপর পারসিয়ানগণ দুইবার আক্রমণ চালায়। প্রথমবারে সাইরাস এবং দ্বিতীয়বারে দারা উক্ত অভিযান পরিচালনা করেন। সাইরাস বাবেল জয় করিয়া উহার আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষমতা তত্রত্য আমীরগণের হস্তে ন্যস্ত করেন। অতঃপর প্রায় বিশ বৎসর পরে উক্ত আমীরগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অগত্যা তৎকালীন পারস্য সম্রাট দারা পুনর্বার বাবেল আক্রমণ করিয়া জয় করেন।

সকল ইতিহাসকারের সর্বসম্মত অভিমত এই, তৎকালে বাবেলের ন্যায় সুদৃঢ় ও দুর্জয় শহর আর একটিও ছিল না। উহার চতুষ্পার্শে উপর্যুপরি চারিটি দেওয়াল এত দৃঢ় ও উঁচুভাবে স্থাপিত ছিল, যাহা জয় করিবার কল্পনাও দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। এতদ্‌সত্বেও সাইরাস নগরবাসীগণের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং 'দোয়াবার' সমগ্র এলাকা জয় করিয়া শহরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যেহেতু বেলশাজারের অত্যাচারে শহরবাসীগণ উত্যক্ত ছিল এবং সাইরাস তাহাদের ত্রাণকর্তাস্বরূপ আসিয়াছিলেন, তাই তাহারা সাইরাসকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল, এমন কি বাবেল রাজ্যের এক প্রাক্তন গভর্ণর (গোব্রিয়াস) তাঁহার সঙ্গে যোগ দিল। গ্রীক ইতিহাসকার হিরোডোটাসের বর্ণনা মতে দেখা যায়, গোব্রিয়াস বিভিন্ন দিকে খাল খনন করিয়া নদীর পানি সরাইয়া দিয়াছিল এবং একদল সৈন্য লইয়া শুকনদী অতিক্রম করতঃ সাইরাসের পূর্বেই শহরে প্রবেশ করিয়া উহা জয় করিয়াছিল।

তৌরাতের বর্ণনায় দেখা যায় সম্রাট সাইরাসের আবির্ভাব এবং বাবেল বিজয় বনী ইসরাঈলদের মুক্তি ও শান্তির নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। সাইরাসের আবির্ভাব ও বিজয়সমূহ ঠিক সেইভাবেই দেখা গেল, যেভাবে এক শত ষাট বৎসর পূর্বে হযরত ইয়াসইয়া (আঃ) ও ষাট বৎসর পূর্বে হযরত ইয়ারমিয়া (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানিতে পারিয়া স্বীয় জাতিকে সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। বস্তুত, সাইরাস দানিয়েল নবীকে (আঃ) অত্যন্ত মর্যাদা দান করিলেন এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে জেরুজালেমে বসবাস করিবারঅনুমতি দান করিলেন। অধিকন্তু তিনি সমগ্র রাজ্যময় ঘোষণা করিলেন : খোদা আমাকে জেরুজালেমে তাঁহার জন্য একটি গীর্জা তৈরী করিবার নির্দেশ দান করিয়াছেন। হযরত সোলায়মানের (আঃ) প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ও ধ্বংসোন্মুখ গীর্জাটিকে আমি নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং রাজ্যের সকলকেই উহার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করিবার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি নবুকদরজার (বখতে নসর) কর্তৃক গীর্জা হইতে লুণ্ঠিত সকল স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র রাজকোষ হইতে পুনরায় সেই গীর্জায় প্রদানের জন্য তৎকালীন ইয়াহুদী সর্দার শীশবজরের হস্তে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাহাকে নির্দেশ দিলেন, গীর্জা সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র যেন পাত্রগুলি উহার

যথাস্থানে স্থাপিত হয়।

বাবেল বিজয়ের পরে সাইরাসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমস্ত পশ্চিম এশিয়ায় স্বীকৃত হইল। খৃঃ পূঃ ৫৩৯ শব্দে তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমগ্র দুনিয়ার বুকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। মাত্র বার বৎসর পূর্বের তিনি ছিলেন পারস্যের পাহাড় ও জঙ্গলে নির্বাসিত এক নিরুদ্দেশ বালক। আজ তিনি যে সকল দেশ যুগ যুগ ধরিয়া সকল উন্নত ও বিজয়ী জাতিসমূহের কেন্দ্রস্থল ছিল, সেই সমস্ত দেশের একনায়কত্ব লাভ করিলেন। বাবেল বিজয়ের পরেও তিনি প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং খৃঃপূঃ ৫৩৯ অব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী

কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করিবার পূর্বে এই কথাটিই এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, বনী ইসরাঈলের নবীগণ জুলকারনায়েন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন এবং ইয়াহুদীগণের বিশ্বাস মতে উহা কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

এ ব্যাপারে প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেন হযরত ইয়াসইয়া (আঃ)। সাইরাসের বাবেল বিজয়ের ১৬০ বৎসর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি প্রথমে বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসপ্রাপ্তি সংবাদ দান করেন। অতঃপর বাবেল বিজয়ীর দ্বারা উহা পুনর্নির্মিত হইবে বলিয়া তিনি সুসংবাদও দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি খোরেসের (সাইরাস) অভ্যুত্থানবার্তা জ্ঞাপন করেন। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল নিম্নরূপ :

তোমাদের মুক্তিদাতা প্রভু বলিতেছেন : জেরুজালেম পুনরায় তৈরী করা হইবে। ইয়াহুদীদের শহর পুনর্গঠিত হইবে। আমি তাহাদের ধ্বংস-প্রাপ্ত গৃহগুলি আবার তুলিব। আমি খোরেস সম্পর্কে বলিতেছি, সে আমার আজ্ঞাবহ রাখাল। সে আমার সকল ইচ্ছা পূরণ করিবে। খোদা তায়ালা স্বীয় মসীহ খোরেস সম্পর্কে এরূপ বলিতেছেন, আমি তাহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়াছি যেন অন্যান্য জাতি তাহার করতলগত হয়। অন্যান্য বাদশাহ্‌র কক্ষ ও দ্বিদ্বারগুলি তাহার হস্তে উন্মুক্ত করা হইবে। হাঁ আমি তোমার অগ্রে থাকিব। আমি জটিল পথকে সহজ করিয়া দিব, আমি পিতলের কঠিন দ্বারগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দিব। আমি

ধ্বংসে পড়া রাজকোষ এবং গুপ্ত খনিসমূহ তোমাকে দান করিব। আর এসব তো এই জন্যই করিব, যেন তুমি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হও, আমি খোদাওন্দ বনী ইসরাঈলের সেই উপাস্য প্রভু : যিনি স্বীয় মর্যাদায় ভূষিত বনী ইসরাঈলদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে তোমার নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন!" ইয়াসইয়াহ : ২১:২৪)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে খোদাতায়ালার এই ফরমান প্রচার করা হইয়াছে যে, সাইরাস তাঁহার রাখাল এবং তিনি বনী ইসরাঈলদিগকে বাবেল বাদশাহর অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে নাম লইয়া আহ্বান করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহাকে তিনি খোদার 'মসীহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

অনুরূপ হযরত ইরায়মিয়াহ আঃ) মাত্র ষাট বৎসর পূর্বে এক ভবিষ্যদ্বাণী দান করেন। তিনি বলেন :

"(আল্লাহ বলেন) জাতিসমূহের মধ্যে এ কথা প্রচার করিয়া দাও এবং ইহা গোপন করিও না। তুমি বলিয়া দাও, বাবেল বিজিত হইল। বায়াল অবমানিত হইল। মরদুক বরবাদ হইল। তাহার প্রতীমাগুলিকে পেরেশান করা হইল। কেননা, উত্তর দিক হইতে এক জাতি তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তাহাদের দেশকে উজাড় করিবে। এমন কি তথায় কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।"

হযরত ইয়ারমিয়াহ (আঃ) তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে আরও জানাইলেন, ইয়াহুদীগণ সত্তর বৎসর পর্যন্ত বাবেলে অবরুদ্ধ থাকিবে। অতঃপর বায়তুল মোকাদ্দাসকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা হইবে। তিনি বলেন :

"খোদাতায়ালা বলিতেছেন : যখন বাবেল সত্তর বৎসর অবরুদ্ধ থাকিবে, তখন আমি তোমাদের খবর লইতে আসিব। তখনই তোমরা আমাকে ডাকিবে এবং আমিও তোমাদের জওয়াব দিব। তোমরা আমাকে সন্ধান করিবে, আমিও তোমাদিগকে ধরা দিব। আমি তোমাদের অবরোধ অবস্থার অবসান ঘটাইব। তোমাদিগকে তোমাদের স্বগৃহে ফিরাইয়া লইয়া আসিব।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা স্বীয় অনুকম্পা পুনঃ প্রদর্শনের ব্যাপারটি বাবেল বিজিত হওয়ার ঘটনাটির সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। সাইরাসের আবির্ভাব যেন তাঁহার অনুকম্পা স্বরূপ হইবে। বনী ইসরাঈলগণ খোদাকে পুনরায় স্মরণ করিয়া উক্ত অনুকম্পাই লাভ করিবে।

তৌরাত হইতে একথাও জানা যায়, যখন সাইরাস বাবেল জয় করিলেন, হযরত দানিয়াল (আঃ) তখন তাঁহাকে হযরত ইয়াসইয়ার (আঃ) একশত ষাট বৎসর পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী দেখাইলেন। হযরত দানিয়াল (আঃ) তখন বাবেলের বাদশাহর অন্যতম উজীর ছিলেন। ইহাতে সাইরাস অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রভাবান্বিত হন এবং অনতিকালের মধ্যে তিনি গীর্জা পুনর্নির্মাণের নির্দেশ জারী করেন।

আধুনিক যুগের সমালোচকগণ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আস্থাবান নহেন। তাহারা বলেন : সম্ভবত ঘটনা অনুষ্ঠিত হইবার পরেই এই সব ভবিষ্যদ্বাণী সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিশেষত হযরত ইয়াসইয়ার আঃ ভবিষ্যদ্বাণীতে খোরেসের (সাইরাস) নাম উল্লেখ থাকায় সে সম্পর্কে অধিক সন্দেহ পোষণ করা হয়। কিন্তু সমালোচকগণ তাহাদের সমর্থনে অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা কোন ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। কেননা ধর্মগ্রন্থকে ঐশীবাণী বলিয়াই সকল যুগের অধিকাংশ মানব গোষ্ঠী স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তৌরাতের শেষ খণ্ড যাহা বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় কিংবা বাবেল অবরোধের সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, প্রামাণ্য ইতিহাস হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই হইতে উহা ইয়াহুদীগণের মধ্যে অপরিবর্তিত রূপে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। অধিকন্তু এমন কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় নাই যে, উহা বিনষ্ট হইয়া পুনর্লিখিত হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। সেক্ষেত্রে শুধু এতটুকু অনুমান করা যাইতে পারে, হযরত ইয়াসইয়ার আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতেও হয়ত হযরত দানিয়ালের (আঃ) স্বপ্নের ন্যায় খোরেশের নাম উল্লেখ করা হইয়াছিল না। কেবলমাত্র তাঁহার জাতি ও দেশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। পরে ইয়াহুদীগণ, এই নাম সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সমগ্র দুনিয়ার ইয়াহুদীদের মধ্যে এই বিশ্বাস বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে যে, সাইরাসের আবির্ভাব নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই ঘটিয়াছিল। আর তিনি খোদার মনোনীত ও প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং বাবেল অধিপতির অত্যাচার হইতে খোদার দাসগণকে মুক্তি দানের জন্য আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কোরানের আলোকে সাইরাস

এখন চিন্তা করুন, কোরআনের বর্ণনায় যে চিত্র অংকিত হইয়াছে, উহা শুধুমাত্র সাইরাসের সংগেই খাপ খাইতেছে নয় কি? এই প্রসংগ আলোচনার পুর্বে আমি কোরআনের বর্ণনার সারকথা বলিয়া দিয়াছি। উহা সাতটি দফায় বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইগুলির উপরে আরেকবার দৃষ্টিপাত করুন।

(১) সর্বপ্রথম এই ব্যাপারটি চিন্তা করুন; জুলকারনায়েন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন যে ইহুদীদের তরফ হইতেই হইয়াছিল সে সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত নাই। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার, ইয়াহুদীগণ যদি অন্য কোন সম্প্রদায়ের বাদশাহকে মর্যাদা দান করিয়া থাকে, তাহা একমাত্র সাইরাসকেই দান করিয়াছে। নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর তিনিই ছিলেন লক্ষ্য, দানিয়াল নবীর স্বপ্নের তিনি ছিলেন বাস্তবমূর্তি। তাহার জন্যই বনী ইসরাঈলদের উপর আল্লাহর রহমৎ পুনরায় বর্ষিত হইল। তিনিই বনী ইসরাঈলদের ত্রাণকর্তা খোদার প্রেরিত রাখাল মসীহ এবং জেরুজালেমের পুনর্নির্মাতা। সুতরাং ইহা হইতে স্বাভাবিক কথা আর কি হইতে পারে যে ইয়াহুদীদের জিজ্ঞাসা জুলকারনায়েন তিনিই?

নবীর যে বর্ণনাটি কুরতুবী ও অন্যান্য সকলে নকল করিয়াছেন, উহাতে সেই দিকে সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। যেমন :

قال قالت اليهود اخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التورات الا في مكان واحد قال ومن ؟ قالوا ذو القرنين

অর্থাৎ : ইয়াহুদীগণ আমাদের হুজুরের(সঃ) নিকট প্রশ্ন করিল : যাহার নাম তৌরাতে শুধুমাত্র একস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই নবী সম্পর্কে আমাদিগকে কিছু বলুন। হুজুর (সঃ) প্রশ্ন করিলেন : তিনি কে? তাহারা জওয়াব দিল : জুলকারনায়েন।

যেহেতু সাইরাসের জুলকারনায়েন খ্যাতিলাভের ইংগিত কেবলমাত্র

হযরত দানিয়ালের (আঃ) স্বপ্নেই দান করা হইয়াছে, তাহা ইয়াহুদীদের উপরোক্ত বর্ণনা সেই দিকেই ইংগিত করিতেছে।

এতদভিন্ন সাইরাসের প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এ ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, সাইরাসের মস্তকে দুই শিং বিশিষ্ট মুকুট রহিয়াছে এবং উহা মেডিয়া ও পারস্য রাজ্যদ্বয়ের একত্রীকরণের প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত।

(২) এক্ষণে কোরআনের বর্ণনা সম্মুখে রাখুন। জুলকারনায়নে যে গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝

অর্থাৎ: আমি তাহাকে পৃথিবীর বুকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই সরবরাহ করিয়াছিলাম।

আল্লাহতায়ালা যখন কোন মানুষের সাফল্য ও উন্নতিকে নিজের সংগে সংযুক্ত করেন, তদ্বারা সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যই বুঝা যায় যে, সেই ঘটনা অন্যান্য স্বাভাবিক ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উহা আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও অবদান স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন, হযরত ইউসুফ আঃ) সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেন:

كَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ: এইভাবে আমি ইউসুফকে মিশরভূমিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিলাম।

এক্ষেত্রে সকলেরই জানা আছে, হযরত ইউসুফকে (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া অস্বাভাবিক ভাবেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদ্রূপ জুলকারনায়েনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভও নিতান্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্য দিয়া হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই উহা কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহে হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে। সে ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাহার ক্ষমতা ও লাভকেও একমাত্র খোদার অনুগ্রহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইভাবে কোরআনের বর্ণনার সহিত সাইরাসের ক্ষমতা লাভের ইতিহাস হুবহু মিলিয়া যায়। তাহার প্রাথমিক জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী একটি বিস্ময়কর উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার জন্মের পূর্বেই মাতামহ তাঁহার মৃত্যুর আকাঙ্খী সাজিল। জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ বাঁচাইল। তখন তিনি শাহী পরিবার ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ মেষের ন্যায় পাহাড়ে বিচরণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। অতঃপর অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করতঃ বিনা রক্তপাতে মেডিয়ার সিংহাসন দখল করেন। নিঃসন্দেহে এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে সংঘটিত হয় না। এ সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের অত্যাশ্চর্য লীলা। উহাতে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা তাঁহাকে কোন এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিবিধ বৈচিত্র্যের মাধ্যমে উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সহসা একদিন দেখা গেল যে, তাহার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য যুগের স্বাভাবিক গতিপথের মোড় ফিরিয়া গেল।

৩ অতঃপর তাঁহার তিনটি অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম অভিযান পশ্চিম অঞ্চলে,[১] দ্বিতীয়টি পূর্বাঞ্চলে এবং তৃতীয়টি এরূপ এক পার্বত্য এলাকায় পরিচালিত হইয়াছিল, যেখানে কোন অসভ্য জাতির বাস ছিল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারে ছিল সে স্থান জর্জরিত। এখন লক্ষ্য করুন যে, কোরআনের এই বর্ণনা সাইরাসের অভিযানের সঙ্গে কিভাবে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে।

পশ্চিমে অভিযান

ইতিপূর্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, সাইরাস মেডিয়া ও পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই এশিয়া মাইনরের বাদশাহ ক্রোয়েসাস অকস্মাৎ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এশিয়া মাইনরের এই রাজবংশ 'লিডিয়া' নামে পরিচিত ছিল এবং উহার প্রতিষ্ঠা-কাল তখন প্রায় এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। এশিয়া মাইনরের

১ কোরআন শরীফে পশ্চিম দেশকে 'মাগরেবুশ শামস' (সূর্যাস্তের দেশ) ও পূর্বাঞ্চলকে 'মাতলউশ্ শামস্' (সূর্যোদয়ের দেশ) বলা হইয়াছে। তৌরা-তেরও বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, হযরত যাকারিয়ার (আঃ) গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ মোজাহেদগণের প্রভু বলিয়াছেন যে, আমি স্বীয় বাহিনীকে সূর্যোদয়ের দেশ এবং সূর্যাস্তের দেশ হইতে উদ্ধার করিব।

তৎকালীন রাজধানী ছিল সার্ডিস। সাইরাসের সিংহাসন লাভের পূর্বেই লিডিয়া রাজবংশের সংগে মেডিয়ার অধিপতির কয়েকটি যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে ক্রোয়েসাসের পিতা সাইরাসের মাতামহ আষ্ট্যাগিসের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এমনকি এই বন্ধুত্বের স্থায়িত্বের জন্য উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। কিন্তু ক্রোয়েসাস সে সকল সম্পর্ক ও চুক্তি বেমালুম ভুলিয়া গেলেন। তিনি সাইরাসের আশ্চর্যজনক অভ্যুত্থানকে কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সাইরাস মেডিয়া ও পারস্যের একত্রীকরণের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিলেন, তাহা তাঁহার আদৌ পছন্দ হইল না। সুতরাং তিনি প্রথমে ব্যাবিলন, মিশর ও স্পার্টার শাসনকর্তাগণকে সাইরাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলেন এবং আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়া পেট্রিয়া শহর দখল করিয়া লইলেন।

এমতাবস্থায় ক্ষিপ্রগতিতে উহা প্রতিরোধ করা ছাড়া সাইরাসের গত্যন্তর ছিল না। তিনি রাজধানী হেগমাতানা (হামদান)[১] হইতে শত্রুর দিকে এরূপ দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন যে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পেট্রিয়া ও সার্ডিয়ার নিকটে দুইটি ঘোরতর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি লিডিয়াদের সকল রাজ্য হস্তগত করিলেন।

হিরোডোটাস উক্ত যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ চমকপ্রদভাবে দান করিয়াছেন। কিন্তু উহা আলোচনার স্থান ইহা নহে। তিনি বলেনঃ সাইরাসের বিজয় এত বিচিত্র ও বিস্ময়কর ছিল যে, পেট্রিয়ার যুদ্ধের পরে মাত্র চৌদ্দ দিনের ভিতরে তিনি লিডিয়া রাজবংশের সুদৃঢ় রাজধানী সার্ডিস জয় করিলেন এবং বাদশাহ ক্রোয়েসাস বন্দী হইয়া তাঁহার দরবারে অবনত মস্তক দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন।

এক্ষণে পারস্য উপসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমগ্র এশিয়া মাইনর তাঁহার করতলগত হইল। অতঃপর তিনি এই দিগ্বিজয়ের অভিযান পূর্ণভাবে শুরু করিলেন। সেখান হইতে তিনি সোজাসুজি সম্মুখের দিকে অগ্রসর

১ দারার শিলালিপিতে এরূপ নামই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু হিরোডোটাস প্রমুখ গ্রীক ইতিহাসকারগন উহাকে 'আকবাটানা' নাম দিয়াছেন। সুতরাং গোটা ইউরোপে এই নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

হইলেন এবং জয় করিতে করিতে সুদুর পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল। বারশত বৎসর পরে মহাবীর তারেককেও অনুরূপ উত্তর আফ্রিকা জয় করিতে করিতে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে পৌঁছিয়া হঠাৎ থামিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার বিজয় অভিযান সীমাহীন প্রান্তর কিংবা অত্যুচ্চ পর্বতের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই। পারস্য হইতে অগ্রসর হইয়া তিনি লিডিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত চৌদ্দশত মাইল অব্যাহত গতিতে জয় করিয়া আসিলেন। কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিবার মত কোন সরঞ্জাম তাঁহার হাতে ছিল না। তিনি তখন সম্মুখে দৃষ্টি ফেলিলেন, যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পানি আর পানির অনন্ত তরঙ্গমালা দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন যে, মহা জ্যোতিষ্কও উহার অতল তলে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। এই অভিযান শুধু মাত্র পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করিবার জন্যই পরিচালিত হইয়াছিল। তাই তিনি পারস্য হইতে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সেই দিকের ভূখণ্ডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিলেন। ইহাই ছিল মাগরেবুশ শামসের শেষ সীমারেখা।

মানচিত্র খুলিয়া এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূল দেখুন। দেখিবেন যে, সমগ্র উপকূলভাগটি কতকগুলি ক্ষুদ্র উপসাগরের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্মার্নার নিকটবর্তী জলভাগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে এমনভাবে পরিবেষ্টিত রাখিয়াছে যে, বাহ্যত উহা একটি বৃহৎ হ্রদরূপে প্রতীয়মান হয়। লিডিয়ার রাজধানী সার্ডিস পশ্চিম উপকূলের নিকটবর্তী এলাকায়ই অবস্থিত ছিল এবং উহা বর্তমান স্মার্না হইতে খুব বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। এরূপাবস্থায় সাইরাস সম্ভবত সার্ডিস হইতে অগ্রসর হইয়া ঈজীন উপসাগরের তীরে পৌঁছিয়াছিলেন। কেননা উহাই স্মার্নার নিকটবর্তী জলভাগ ছিল। এখানে পৌঁছিয়াই তিনি হয়ত উপসাগরটিকে একটি হ্রদের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত ছিল। উহার পানিও তখন সম্পূর্ণ ঘোলাটে প্রতীয়মান হইতেছিল। সুতরাং তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সূর্য একটি কর্দম-জল পূর্ণ কূপে নিমজ্জিত হইল। এই অবস্থাটিকেই কোরআনে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ (٨٦)

অর্থাৎ : উহা এরূপ দেখা ইতেছিল যেন সূর্য এক কর্দমাক্ত কূপে আত্ম-গোপন করিতেছে।

এ কথা সত্য যে, সূর্য কোথাও অস্ত যায় না। কিন্তু সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া যে কোন লোক এই দৃশ্যই দেখিতে পায় যে, একটি সোনার থালা ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতল জলে নিমজ্জিত হইতেছে।

পূর্বাঞ্চলে অভিযান

সাইরাসের দ্বিতীয় অভিযান পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত হয়। হিরোডোটাস এবং টিসিয়াজ[১] উভয়ই তাহার পূর্বাঞ্চল অভিযান সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন। এই অভিযান লিডিয়া রাজ্য বিজয়ের পরে ও বাবেল বিজয়ের পূর্বে পরিচালিত হয়। উভয় ইতিহাসকারই বর্ণনা করেন যে, পূর্বাঞ্চলের কতিপয় দুর্ধর্ষ যাযাবর গোত্রের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেই এই অভিযান পরিচালিত হয়। ইহা কোরআন পাকের বর্ণনার সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে :

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۝ (৯০)

অর্থাৎ : যখন সে পূর্ব দেশে পৌঁছিল, এমন এক জাতির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল, সূর্য-রশ্মির জন্য যাহারা কোনই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিত না। অর্থাৎ তাহারা ছিল গৃহশূন্য যাযাবর জাতি।

এই যাযাবর গোত্র কাহারা? উক্ত ইতিহাসকারদ্বয়ের মতে, তাহারা বেকড়িয়া বা বলখের অধিবাসী ছিল। মানচিত্র সম্মুখে রাখিলে দেখিতে

---

১ টিসিয়াজ একজন গ্রীক ইতিহাসকার ছিলেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৪১৪ হইতে ৪৯৮ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্যন্ত পারস্যের শাহী দরবারে চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উহার কিছু পরেই তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তিকালের কোন কোন গ্রীক ইতিহাসকার তাঁহার দুই একটি বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুতরাং তাঁহার ইতিহাস হিরোডোটাসের (জন্ম খৃঃ পূ ৪৮৪) ইতিহাসের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে নাই। তবে আধুনিক যুগের ইতিহাস কারগণ উভয়কে নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

পাইবে যে, বলখ পারস্যের পূর্ব অঞ্চলের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। কেননা উহার পরেই পাহাড় রহিয়াছে এবং সম্মুখে অগ্রসর হইবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। উপরোক্ত বর্ণনায় এই আভাসও পাওয়া গিয়াছে যে, গীডর্দে সিয়ার (মাকরান) দুর্ধর্ষ গোত্রগুলি পারস্যের পূর্ব সীমান্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত দানের জন্য সাইরাসকে এই অভিযান পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। গীডর্দে সিয়াকেই আধুনিক যুগে মাকরান বলা হয়।

এই অভিযানের বর্ণনায় ভারত জয় সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, মাকরানের পরে এইদিকে তিনি আর অগ্রসর হন নাই। যদি কিছুটা অগ্রসর হইয়াও থাকেন, তাহা সম্ভবত সিন্ধুনদের অববাহিকা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা সম্রাট দারার যুগেও পারস্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত শুধুমাত্র সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উত্তরাঞ্চলে অভিযান

সাইরাসের তৃতীয় জয়যাত্রা এমন এক অঞ্চলে পরিচালিত হইয়াছিল যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচার অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। ইহা সুনিশ্চিতভাবে উত্তরাঞ্চলে অভিযান ছিল এবং কাস্পিয়ান সাগর ডাইনে ছাড়িয়া সুদূর ককেশাশ পর্বতমালা পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল।

সেখানে পৌঁছিয়া তিনি এক গিরিপথের সন্ধান পাইলেন। উহা দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এই পথেই ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্র আসিয়া লুঠতরাজ ও অত্যাচার চালাইত। সুতরাং তিনি সেই গিরিপথ বন্ধ করিবার নিমিত্ত একটি দেয়াল নির্মাণ করিলেন। ইহাই ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর নামে অভিহিত হইয়াছে।

কোরআন পাক এই অভিযানের বর্ণনা এইরূপ দান করিয়াছেন :

حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا

قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ (৯৩)

অর্থাৎ : এমনকি সে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইল। উহার অপর পার্শ্বে সে এমন এক জাতির সন্ধান লাভ করিল যাহারা তাহার কোন কথাই বুঝিত না।

এখানে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, "দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী পথ" বাক্যাংশে দ্বারা ককেশাশের দুই অংশের মধ্যবর্তী গিরিপথকেই বুঝান হইয়াছে। কেননা, উহার ডান দিকেই কাস্পিয়ান সাগর। উহা উত্তর-পূর্বদিকের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বামদিকে রহিয়াছে কৃষ্ণ সাগর। উহা দ্বারাও পশ্চিম-উত্তর দিকের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। মধ্যস্থলে অবস্থিত গগনচুম্বী ককেশাশ পর্বতমালা- এক প্রাকৃতিক দেয়ালের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এমতাবস্থায় উত্তরাঞ্চলের কোন জাতি যদি দক্ষিণাঞ্চল লুঠতরাজ করিতে চাহিত, তাহা হইলে উহা শুধুমাত্র ককেশাশ পর্বতমালার মধ্যবর্তী গিরিপথ বা সমতলভূমি পার হইয়াই সম্ভবপর হইত। সুতরাং এই পথেই যে ইয়াজুজ-মাজুজ গোত্র দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালাইত তাহা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যাইতে পারে। এরূপ অবস্থায় এই একমাত্র পথটি প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে কাস্পিয়ান সাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ উত্তরাঞ্চলের সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ হইতে পারে বলিয়াই জুলকারনায়েন উক্ত প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই প্রাচীর নির্মাণের ফলে সাগর ও পাহাড়ে মিলিয়া এরূপ সুদূর বিস্তৃত একটি প্রাকৃতিক মহা দেয়াল সৃষ্টি হইল যাহা সমগ্র এশিয়া মাইনর সহ ইরান, সিরিয়া, এরাক, আরব এমনকি মিশরের ভূখণ্ডের জন্যও উত্তরাঞ্চলের আক্রমণের বিরুদ্ধে এক রক্ষাকবচ হইয়া দাঁড়াইল।

মানচিত্র খুলিয়া দেখিতে পাইবে যে, সমগ্র পশ্চিম এশিয়া কাস্পিয়ান সাগরের নিম্নভাগে অবস্থিত। উহার বাম দিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কৃষ্ণসাগর বিদ্যমান। মধ্যভাগে কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূল হইতে কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ককেশাশ পর্বতমালা দেখিতে পাইবে। উভয় সাগর ও মধ্যবর্তী পাহাড়ে মিলিয়া এমন এক প্রাকৃতিক প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে যাহা বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়িয়া বিদ্যমান। এরূপ অবস্থায় উত্তরাঞ্চলের কোন জাতির দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে হইলে তাহা অবশ্যই ককেশাশের দুই অংশের মধ্যবর্তী গিরিপথে বৈ সম্ভবপর হইতে পারে না। জুল-

কারনায়েন সেই পথটিও বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং উহার ফলে উত্তর ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যবর্তী এই যোগসূত্রটি সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল।

এখন শুধু এই প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিল যে, সেখানে জুলকারনায়েন যে অবোধ জাতির সন্ধান লাভ করিলেন, তাহারা কোন্ জাতি? সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাইলে দুইটি জাতিই আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। উক্ত দুই জাতি সেই সময়ে উহার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করিত বলিয়া ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে বসবাস করিত। গ্রীক ইতিহাসকারগণ তাহাদিগকে 'কাস্পিয়ানা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এমনকি তাহাদের নামানুসারেই 'কাস্পিয়ান সাগর' এর নাম রাখা হইয়াছে। অপর জাতি উক্ত স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মূল ককেশীয় ভূখণ্ডে বসবাস করিত। গ্রীক ইতিহাসকারগণ তাহাদিগকে 'কোলচী' বা 'কোলশী' নামে অভিহিত করেন। সম্রাট দারার শিলালিপিতে[১] তাহাদের নাম 'কোলশিয়া' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দুই জাতির কোন এক জাতি কিংবা উভয় জাতিই জুলকারনায়েনের নিকট ইয়াজুজ মাজুজের অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছিল। যেহেতু তাহারা আদিম জাতি ছিল, তাই বলা হইয়াছে যে, তাহারা কথাই বুঝিত না।

(৪) অতঃপর জুলকারনায়েনের যে গুণ আমাদের বিবেচ্য তাহা হইল তাঁহার ন্যায়নীতি ও মানব-সেবার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ। আর এই গুণ দুইটি সাইরাসের চরিত্রে সমুজ্জ্বল যে, ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টি সেক্ষেত্রে তাহাকে ছাড়া অন্য কাহারও কল্পনাও করিতে পারে না।

কোরআনের বর্ণনায় জানা যায় যে, পশ্চিম দেশে যে জাতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে খোদার নির্দেশ ছিল এই :

يَاذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ○

অর্থাৎ : হে জুলকারনায়েন। এই জাতি এখন তোমার করতলগত

---

১ প্রথম দারায়ুসের উক্ত শিলালিপিতে পুরাকালের ঐতিহাসিক তথ্যাদানের ব্যাপারে গুরুত্ব রাখে। উহাতে তিনি তাঁহার বিজিত আটাশটি দেশ এবং প্রদেশের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রায়গুলির ভৌগোলিক অবস্থান জানা গিয়াছে। শুধু এই দুই একটি নামে মতভেদ রহিয়াছে।

হইয়াছে। তুমি এখন যেভাবে ইচ্ছা তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে পার। ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতে পার অথবা বন্ধু হিসাবেও গ্রহণ করিতে পার।

উপরোক্ত আয়াত নিঃসন্দেহে এশিয়া মাইনরের অধিবাসীদের সম্পর্কে নাজিল করা হইয়াছে। তাহারা ছিল গ্রীক জাতি। তাহাদের বাদশাহ ক্রোয়েসাস সকল প্রকার সম্পর্ক ও চুক্তি ভুলিয়া গিয়া অহেতুকভাবে সাইরাসের রাজ্য আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এমন কি শুধু তিনি নিজে আক্রমণ করিয়াই তৃপ্ত থাকেন নাই, বরং অন্যান্য সমসাময়িক রাজন্যবর্গকেও সাইরাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া নিজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর যখন খোদার মদদের অসীম লীলা কার্যকরী হইল এবং সমগ্র এশিয়া মাইনর সাইরাসের করতলগত হইল, তখন আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ আসিল যে, এখন যাহা খুশী করিতে পার। কেননা এই জাতি এখন সর্বতোভাবে তোমার দয়ার উপর নির্ভরশীল। অবশ্য তাহারা স্বীয় অন্যায় ও অত্যাচারের দরুন শাস্তি পাইবারই যোগ্য। অর্থাৎ খোদা তোমাকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। শত্রুদল পরাজিত হইয়াছে। এখন তাহারা সম্পূর্ণ তোমার অনুগ্রহের ভিখারী। কিন্তু তোমার এখন প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করাই উচিত। কেননা, উহাই পুণ্য ও মহানুভবতার পন্থা। বস্তুত, জুলকারনায়েনও তাহাই করিলেন। তিনি বলিলেন :

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ

فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۝ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً

الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝

অর্থাৎ : সে ঘোষণা করিল, আমি অতীতের অপরাধের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিতে চাই না। আমার পক্ষ হইতে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা দান করা হইল। অবশ্য ভবিষ্যতে যদি কেহ কোন অপরাধমূলক কার্য করে, নিশ্চয় আমি তাহাকে শাস্তি দান করিব। তদুপরি তাহাকে একদিন মৃত্যুবরণ

করিতে হইবে। সেখানেও স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে তাহাকে শাস্তি বরণ করিতে হইবে। বরঞ্চ যাহারা আমার বিধান মানিয়া চলিবে এবং সৎলোক বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহার জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার রহিয়াছে। সে আমার আইনকানুন খুবই সহজ দেখিতে পাইবে। আমি খোদার বান্দাগণের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা রাখি না।

কোরআনে বর্ণিত জুলকারনায়েনের এই ঘোষণার হুবহু প্রমাণ আমরা গ্রীক ইতিহাসকারদের গ্রন্থে সাইরাস সম্পর্কিত বিবরণীতেই পাই। বর্তমান যুগের সকল ইতিহাসবিশারদই সেইসব গ্রীক ইতিহাসের সত্যতাকে মানিয়া লইয়াছেন।

সকল গ্রীক ইতিহাসকারগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, সাইরাস লিডিয়া এশিয়া মাইনর বিজয়ের পরে সেখানকার অধিবাসীগণের সহিত শুধু ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নহে; অধিকন্তু তাঁহার ব্যবহার মহানুভবতায় পরিপূর্ণ ছিল। কেননা, যদি তিনি তাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতেন, তাহাই হইত ন্যায় ও যথাযোগ্য ব্যবহার। তাহারা যে কাজ করিয়াছিল, তাহাতে অনুরূপ ব্যবহারই তাহারা আশা করিতে পারিত। কিন্তু সাইরাস সেক্ষেত্রে শুধু ন্যায় ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অধিকন্তু তিনি দাক্ষিণ্যের চূড়ান্ত দেখাইলেন। হিরোডোটাস লিখিয়াছেন: সাইরাস তাঁহার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন: শত্রুর সশস্ত্র সৈন্য ব্যতীত অন্য কাহারও উপর যেন অস্ত্রধারণ করা না হয়। এমনকি শত্রুসৈন্যের কেহ যদি আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে তাহাকে যেন কিছুতেই হত্যা করা না হয়। লিডিয়ার বাদশাহ ক্রোয়েসাস সম্পর্কে তিনি ফরমান জারি করিলেন: যে কোন অবস্থাতেই যেন তাহাকে আঘাত করা না হয়। এমনকি যদি সে যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়, তবুও তাহার উপর যেন অস্ত্রধারণ করা না হয়। সৈন্যগণও তাঁহার নির্দেশ এরূপ সততার সহিত পালন করিল যে, সেই দেশের অধিবাসীবৃন্দ যুদ্ধের কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহা যেন শুধু রাজ পরিবারের আত্মকলহ ছিল মাত্র এবং ক্রোয়েসাসের স্থলে শেষ পর্যন্ত সাইরাস রাজমুকুটের অধিকারী হইলেন। ইহা হইতে অধিক কিছু জনসাধারণ টের পায় নাই।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সেই যুদ্ধে সাইরাসের বিজয়ে গ্রীক দেবতা-

গণের পরাজয়ই সূচিত হইয়াছিল। কেননা বিপদের হাত হইতে দেবতাগণ তাহাদের উপাসক ক্রোয়েসাসকে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইলেন। অথচ ক্রোয়েসাস যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার প্রাক্কালে গীর্জায় প্রবেশ করিয়া দৈববাণীর আশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। ডেলফীর গায়েবী আওয়াজদাতা তাহাকে জয় সাফল্যের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বভাবতই এই পরাজয় গ্রীকগণ মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা উহার মধ্যেও চারিত্রিক ও ধর্মীয় জয় অক্ষুন্ন রাখার সূত্র খুঁজিতে প্রয়াসী হইল। তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্রোয়েসাসের পরাজয়বরণের ব্যাপারটি সে দেশে এক রহস্যপূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হইল। গ্রীক দেবতাগণের মাহাত্ম্য ও কৃতিত্ব অক্ষুন্ন রাখা হইল। হিরোডোটাস এ ব্যাপারে লিডিয়া বাসীগণের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই যে, গায়েবী আওয়াজ দাতার জওয়াব নির্ভুল ছিল। কিন্তু ক্রোয়েসাস উহার অর্থ বুঝিয়াছিলেন বিপরীত। অদৃশ্য বাণী ছিল—যদি সে পারস্য আক্রমণ করে তাহা হইলে একটি বিরাট দেশ ধ্বংস করিবে। অর্থাৎ সে নিজের বিশাল রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। অথচ ক্রোয়েসাস ধারণা করিলেন যে, তাঁহার আক্রমণের ফলে পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহারা আরও বলে: সাইরাস প্রথমে নির্দেশ জারি করিয়াছিলেন যে, একটি চিতা সজ্জিত করিয়া ক্রোয়েসাসকে উহাতে স্থাপন করতঃ আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হউক। তদনুসারে কাজও করা হইয়াছিল। কিন্তু জ্বলন্ত চিতার উপর বসিয়া ক্রোয়েসাস সাইরাসকে এরূপ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনাইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ চিতা নির্বাপিত করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নির্দেশ দিলেন। তবে, তখন আগুনের তেজ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাড়াতাড়ি উহা নির্বাপিত করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল না। সেমতাবস্থায় ক্রোয়েসাস স্বয়ং এপোলো দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং আকাশ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হইয়া গেল। এই-ভাবে দেবতাদের কেরামতি ও বদৌলতে ক্রোয়েসাস বাঁচিয়া গেলেন।

কিন্তু গ্রীক ইতিহাসকার হিরোডোটাস ও যীনোফোনের বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, সাইরাস একদিকে ক্রোয়েসাসের সাহস ও দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য এবং অপরদিকে গ্রীক দেবতাগণের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই

তাহাকে অনুরূপ দশায় ফেলিয়াছিলেন। সাইরাসের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীকগণ যে দেবতার আশ্বাসবাণী লাভ করিয়া যুদ্ধজয়ের আশায় রণাঙ্গনে নামিয়াছিল, তাহারা এমনকি তাঁহাদের পূজারীগণকেও যে জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে তাহা প্রমাণ করা। সুতরাং তিনি যখন দেখিলেন যে, ক্রোয়েসাস সহ সকলেই দেবতার অক্ষমতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দান করিল, তখনই তাঁহাকে চিতা হইতে উদ্ধার করিবার আদেশ দিলেন। এইভাবে সাইরাস সত্য প্রকাশের যে ব্যবস্থা করিলেন, গ্রীকগণ পরবর্তী কালে উহাকেই এপোলো দেবতার কেরামতি বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের প্রয়াস পাইল।

কোরআনের বর্ণনায় জুলকারনায়েনের যে ঘোষণা রহিয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছেঃ ভবিষ্যতে যে অপরাধ করিবে কেবলমাত্র তাহাকেই শাস্তি দেওয়া হইবে আর যে তাঁহার নির্দেশ মান্য করিবে সে পুরস্কারলাভ করিবে। গ্রীক ইতিহাসকার যীনোফোনও সাইরাসের ঠিক অনুরূপ ঘোষণার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কোরআনের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, সাইরাস অনুগতকে পুরস্কার দান ও অবাধ্যকে শাস্তিদানের ফরমান জারি করিতেন। সকল ইতিহাসবেত্তার সর্বসম্মত অভিমতও এই যে, সাইরাস বিজিত দেশে পৌঁছিয়া অনুরূপ ফরমানই জারি করিতেন। বিশেষত বিজিত দেশের প্রজা সাধারণের সহিত তিনি অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। তিনি প্রজাগণকে পূর্ববর্তী বাদশাহের প্রবর্তিত সকল আইনকানুন ও ফরমান অত্যন্ত সহজসাধ্য ও সহানুভূতিপূর্ণ হইত।

(৫) এখন পর্যন্ত কেবলমাত্র সাইরাসের পশ্চিম দেশে বিজয় এবং সেই সকল এলাকায় তাঁহার অনুসৃত নীতির উপরেই আলোকপাত করা হইল। এখন দেখা যাক, সকল ক্ষেত্রে তিনি সাধারণভাবে কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, কোরআনে বর্ণিত গুণাবলী সাইরাসের মধ্যে বিদ্যমান ছিল কিনা।

এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে গ্রীক ইতিহাসকারদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা সাইরাসের সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন না। তাঁহাদের দেশ ভিন্ন। এমন কি তাঁহারা সাইরাসের শত্রু-শিবিরেরই লোক। কেননা, সাইরাস লিডিয়া জয় করিয়াছিলেন। সেই দেশবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গ্রীকের জাতীয়তা, সভ্যতা, এমন কি গ্রীকবাসীদের ধর্মের ক্ষেত্রে এই পরাজয় ছিল অত্যন্ত মারাত্মক ও অবমাননাকর। শুধু তাহাই নহে, সাইরাস পুরুষানুক্রমে তাহাদিগকে পারস্যের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এইজন্য দীর্ঘদিন অবধি পার্সিয়ান ও গ্রীকদের মধ্যে আন্তরিকতা যে আদৌ ছিল না, তাহা না বলিলেও চলে। সেক্ষেত্রে স্বভাবত এ আশা পোষণ করা বাতুলতা বৈ নহে যে, গ্রীক ইতিহাসকারগণ পারস্য সম্রাটের অকুণ্ঠ গুণগান করিবেন। এতদসত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, সকল গ্রীক ইতিহাসকারই সাইরাসের অসাধারণ প্রভাব ও ঐশ্বরিক গুণাবলীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ রহিয়াছেন। এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার অসাধারণ গুণাবলী জগতে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, শত্রু কি মিত্র কেহই তাহা গোপন করিতে সমর্থ ও সাহসী হয় নাই। অধিকন্তু শত্রু-মিত্র সকলের অন্তরই তাঁহার ঐশ্বরিক গুণাবলীতে বিমুগ্ধ ছিল। তাই সকলের মুখেই তাঁহার অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনা যাইত। তাঁহার সেই প্রকাশ্য দিবালোকবৎ সমুজ্জল গুণাবলীর সাক্ষ্য তাঁহার শত্রুদল হইতেও আমরা শুনিতে পাই। বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসকার যীনোফোন লিখিয়াছেন:

"সাইরাস একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ, বিবেচক ও মহানুভব বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বপ্রকারের রাজকীয় গুণাবলী ও জ্ঞান-প্রসূত সৌন্দর্যাবলীর উত্তম নমুনা ছিল। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত, তাঁহার শানশওকাত হইতেও দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা বহুগুণ অধিক ছিল। বিশেষত তাঁহার মহানুভবতা ও দয়ার তুলনা মিলে না। মানব-প্রীতি ও সেবাসুলভ মনোবৃত্তি তাঁহার শাহী প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

"দুস্থ মানবতার সেবা ও মজলুম মানুষের মুক্তিদানই ছিল তাঁহার সর্ব মুহূর্তের ভাবনা। ব্যথিতের বেদনার অংশ গ্রহণ, বিপর্যস্তের হস্ত ধারণপূর্বক উত্তোলন এবং দীন-দুঃখীদের খোজ-খবর গ্রহণই ছিল তাঁহার জীবনের চরম ও পরম ব্রত। এতকিছু গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী সাইরাসের বিনয়পূর্ণ ও আড়ম্বরহীন জীবন তাঁহার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিশাল সাম্রাজ্য ও অশেষ দৌলতের একচ্ছত্রাধিপতি হইয়াও তিনি অহংকার ও অহমিকার বিন্দুমাত্র ছায়া মাড়ান নাই। অথচ তাঁহার

পদতলে অসংখ্য রাজ্যের রাজা এবং অসংখ্য কোষাগারের ধন বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল।"

হিরোডোটাস লিখিয়াছেন :

"তিনি অত্যন্ত দানশীল বাদশাহ ছিলেন। দুনিয়ার অন্যান্য রাজন্যবর্গের ন্যায় ধনসম্পদ জমা করিবার লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু বদান্যতা ও দানশীলতার প্রেরণা তাঁহাকে প্রবলভাবে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন : সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইল মানবতার সেবা এবং অত্যাচারে প্রতিকার সাধনের সুযোগ ও ক্ষমতা লাভ।

টিসিয়াজ লিখিয়াছেন :

"তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ধন-দৌলত কোন বাদশাহর ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার ও আরাম-আয়েশের জন্য নহে, বরং উহা সার্বিক কল্যাণ সাধন ও অধীনস্থদের উপকারার্থে ব্যয়িত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ এই মহান ব্রতের মাধ্যমেই তিনি সকল প্রজার চিত্ত জয় করিয়া লইয়াছিলেন। প্রজাগণ যে কোন মুহূর্তে তাঁহার জন্য সানন্দে আত্মোৎসর্গ করিতে উৎসুক ছিল।"

উপরোক্ত ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে আমরা সাইরাসের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন মূলতঃ তিনি সেই যুগের মানুষ ছিলেন না। তিনি কোন অতিমানবীয় শক্তির প্রতীক ছিলেন এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁহার দ্বারা স্বীয় লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মাত্র। দুনিয়ার কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন নাই। সেই যুগের কোন সভ্যজাতির মধ্যেও তিনি পালিত হন নাই। তিনি শুধু স্রষ্টার তত্ত্বাবধানে বন-জঙ্গলে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ঠিক তেমনি স্রষ্টার ইঙ্গিতেই তিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে পারস্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকায় রাখালের বেশে কাটাইয়াছিলেন। ইহা কতই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সেই রাখালই যখন বাদশাহ সাজিয়া দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন তিনি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ, অদ্বিতীয় জ্ঞানী এবং অতুলনীয় আদর্শ মানবরূপে প্রতিপন্ন হইলেন।

সাইরাস ও সেকান্দার

অ্যারিষ্টোটলের শিক্ষা-দীক্ষার ভিত্তিতে সেকান্দার-ই-আজম গড়িয়া উঠেন। অতঃপর তিনি দিগ্বিজয়ী বীররূপে পরিগণিত হন। কিন্তু তিনি এত দেশ জয় করা সত্ত্বেও মানবতা ও চরিত্রের কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকও জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? সাইরাসের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য কোন অ্যারিষ্টোটল ছিল না। তিনি মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠশালার স্থলে স্রষ্টার প্রাকৃতিক পাঠশালা হইতেই শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি শাহ সেকান্দারের ন্যায় কেবলমাত্র দেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; মানবতা ও মর্যাদার জগতও তিনি জয় করিয়াছেন।

সেকান্দার-ই-আজমের যে কোন জয়ই তাহার জীবনকাল পর্যন্ত মাত্র স্থায়ী ছিল এবং তাহার মৃত্যুর সংগে সংগেই সকল বিজিত দেশ স্বাধীন হইয়া গেল। কিন্তু সাইরাসের দেশ জয়ের ভিত্তি এরূপ মজবুত ইটের গাঁথুনীতে রচিত হইয়াছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে সুদীর্ঘ দুইশত বৎসরেও উহা বিন্দুমাত্র টলিল না। শাহ সেকান্দার চক্ষু মুদিবার সংগে সংগে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া গেল। পক্ষান্তরে, সাইরাসের অন্তর্ধানের পরে দিন দিন তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার বিজয়ের আওতায় মিসরের স্থান ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য সন্তান কায়কোবাদ সে কোঠাও পূর্ণ করিলেন। অতঃপর মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই পারস্য সাম্রাজ্য প্রায় জগৎ জোড়া বিস্তৃতি লাভ করিল। উহা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের ২৮টি দেশ লইয়া গড়িয়া উঠিল। আর তখন উহার একচ্ছত্রাধিপতি ছিলেন সাইরাসের পৌত্র সম্রাট দারায়ুস।

সম্রাট সেকান্দারের বিজয় অভিযান সম্পূর্ণ দৈহিক বলের ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়াছিল। তাহাতে ছিল অত্যাচার ও বিভীষিকার করাল

ছায়া। কিন্তু সাইরাসের জয় ছিল মানবতার জয় এবং তাঁহার এই অন্তর জয়ের অভিযান তাই সার্থক ও স্থায়ী হইয়াছিল। প্রথমোক্ত বিজয় অভিযান ক্ষণিকের জন্য উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকে বটে, কিন্তু উহা বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকে না। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় জয় হয় স্থায়ী এবং উহা সহজে মিটিবার নহে।

সাইরাস বাবেল বিজয়ের পর দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্য আরব হইতে কৃষ্ণসাগর এবং এশিয়া মাইনর হইতে বলখ পর্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। এশিয়ার সকল জাতিই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালের ভিতরে কোথায়ও কোন প্রকার বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। ইতিহাসকার যীনোফোনের ভাষায় তিনি ছিলেন, 'একমাত্র মানবতার সম্রাট এবং সকল মানুষ ও সম্প্রদায়ের মহানুভব অভিভাবক ও দয়ালু পিতা।" প্রজারা অত্যাচারী বাদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয় বটে ; কিন্তু দয়ালু পিতার বিরুদ্ধে সন্তানগণ বিদ্রোহ করিবে কোন দুঃখে ? আধুনিক যুগের সকল ইতিহাসকারই স্বীকার করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এরূপ বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে রোমক সম্রাটদের কাহারও ভিতর পরিলক্ষিত হয় নাই। সকল ইতিহাসবেত্তার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, সেই যুগের রাজা বাদশাহদের কঠোরতা, নির্দয় ব্যবহার, ভয়াবহ শাস্তির বিধান ইত্যাদির বিন্দুমাত্র নিদর্শন সাইরাসের রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই।

স্মরণ রাখা উচিৎ, ইহা শুধু পুরাকালের ইতিহাসকারগণের বর্ণনাই নহে, বরং আধুনিক যুগের শ্রেণীনির্বিশেষের ইতিহাস বিশেষজ্ঞগণের সর্বসম্মত অভিমত সাইরাস সম্পর্কে ইহাই। এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সাইরাস পৃথিবীর প্রাচীন নরপতিগণের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম সম্রাট ছিলেন। কেননা, তাঁহার ভিতরে একাধারে বিজয়ের প্রসারতা, শাসনক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব এবং অত্যুজ্জ্বল মানবতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। অধিকন্তু, তিনি যে যুগে আবির্ভূত হন, সেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বদিক হইতে মানব জাতির জন্য কল্যাণের ও মুক্তির পয়গাম বহন করিয়া আনিয়াছিল।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জি, বি, গ্রান্ডী বর্তমান যুগে পৌরাণিক

ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ "গ্রেট পার্সিয়ান ওয়ার" সমগ্র দুনিয়ার সুধী-বৃন্দের অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। তিনি উহাতে লিখিয়াছেন :

এই সত্য দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জল, সাইরাসের ব্যক্তিত্ব সেই যুগে নিতান্তই অসাধারণ ছিল। তিনি তাঁহার সমসাময়িক সকল জাতির অন্তরে স্বীয় বিস্ময়কর প্রভাব অংকিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক জীবন পারস্যের নির্জন পার্বত্য এলাকায় অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রাথমিক জীবনে তিনি কিভাবে প্রতিপালিত হন সে সম্পর্কে সক্রেটিসের শিষ্য যীনোফোন দেড়শত বৎসর পরে চমকপ্রদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা উহাতে দেখিতে পাই, মানবীয় গুণাবলীর সর্ববিধ রত্নই তাঁহার ভিতরে সমুজ্জল ছিল। তাঁহার সকল বর্ণনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করিলেও এ কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না সাইরাসের বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অঞ্চল মানবীয় গুণাবলীর অমূল্য রত্নরাজী বিখচিত ছিল। যখন সেই স্বর্ণোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য আশুরীয় ও ব্যাবেলিয়ান সম্রাটদের সহিত তুলনা করা হয়, তখনই উহার চমকপ্রদ দৃশ্য অধিকতর উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়।

তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় লিখিয়াছেন : ইহা মূলতঃ এক বিস্ময়কর সাফল্য ছিল। মাত্র বার বৎসর পূর্বে যে সাইরাস ক্ষুদ্র রাজ্যের অজ্ঞাত ও অখ্যাত অধিপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন, তিনিই বার বৎসর ধরিয়া এশিয়ার সেই সকল দেশ পদানত করিলেন, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া বিরাট ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারী ছিল। সেই সকল দেশের স্বনাম ধন্য সম্রাটগণ দীর্ঘদিন অবধি নিজদিগকে পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা একে একে সাইরাসের কবলে পতিত হইয়া পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেন। আকাদি শাহী বংশের অর্ধ-পৌত্তলিক সারগুন হইতে আরম্ভ করিয়া নাবুকদারযার বখতে নসর পর্যন্ত সকল শাহানশাহের রাজ্যই তাঁহার পদানত হইল। তিনি শুধু একজন বড় দিগ্বিজয়ী ছিলেন না; একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। তদানীন্তন সকল জাতিই তাঁহার সূচীত নবযুগকে শুধু মানিয়া লয় নাই, অধিকন্তু উহাকে অভিনন্দনও জানাইয়াছে। বাবেল বিজয়ের পরবর্তী দশ বৎসরে আর যে সকল দেশ জয় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন একটি দেশেও বিদ্রোহ

বা বিশৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় নাই। নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রভাব প্রজাদের উপর বিরাট ছাপ ফেলিয়াছিল। কিন্তু, তাহা তাঁহার কঠোর প্রকৃতির কারণে আদৌ নহে। তাঁহার রাজত্বের ভিতরে হত্যা কিংবা ফাঁসির শাস্তি ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তখন এমনকি তাম্বিয়ানা দ্বারাও তাহাকে কোন অপরাধের জন্য প্রহার করা হইত না। পাইকারী হত্যার বিধান কোন দিনই তাঁহার রাজত্বে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোন জাতি বা পরিবারকে যে কোন চরম অপরাধের জন্যও নির্বাসন দণ্ডদান করা হইত না। উহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাই, তিনি আশুরীয় ও বাবেলিয়ান শাহানশাহদের সর্বপ্রকারের জুলুম ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন।

"তাঁহার রাজত্বকালে নির্বাসিত জাতিকে স্বদেশে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে। প্রাচীন রীতি-নীতি ও পূজা-পার্বণের বিরুদ্ধে কোনরূপ বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সকল জাতির সর্বপ্রকার অভিযোগের প্রতিকার করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়কে স্ব স্ব ধর্ম পালনের পূর্ণ আজাদী দান করা হইয়াছে। পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত বিভীষিকার শাসনের অবসান ঘটাইয়া তদস্থলে আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতি ও দয়া-দাক্ষিণ্যের পবিত্র যুগের সূচনা করা হইয়াছে।"

এখন ভাবিয়া দেখুন কোরআন পাকে মাত্র কয়েকটি শব্দের ভিতরে যে ব্যাপক ইংগিত দান করা হইয়াছে, অধুনা জগতের ইতিহাসকার উহার ব্যাখ্যায় কত বড় পুঁথি রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন।

৬ একণে কিছুক্ষণের জন্য তৌরাতের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখুন যে, কিভাবে উহাতে সাইরাসের ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তৎসঙ্গে কোরআনের বর্ণনা মিলাইয়া দেখুন যে, উভয় গ্রন্থের বর্ণনায় কি চমৎকার সামঞ্জস্য বিদ্যমান। হযরত ইয়াসইয়াহ নবীর (আঃ) গ্রন্থে বলা হইয়াছে: খোদাতালা বলিতে 'খোরেশ আমারই রাখাল। সে আমার মসীহও বটে।" হযরত ইয়ারমিয়ার (আঃ) বর্ণনা উপরে প্রদান করা হইয়াছে। উহাতেও বলা হইয়াছে, তিনি বাবেলের অধিবাসীগণকে অত্যাচার হইতে মুক্তি দান করিবেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, সাইরাস সেই প্রতিশ্রুত ও প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা বাদশাহ কি না?

যখন আমরা সেই যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করি এবং সম্রাট সাইরাসের ঘটনাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তখন প্রথম দৃষ্টিতেই এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে, তাঁহার আবির্ভাব মূলতঃ সকল নিপীড়িত জাতির প্রতীক্ষার ব্যাপার ছিল। যে কোন জাতির আন্তরিক বাসনা মৌখিক স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল নহে; বরং তাহাদের প্রয়োজনের চাহিদাই সে বাসনার মূল স্বরূপ। সেই যুগের প্রবাহ স্বভাবত কি কামনা করিতেছিল?

বস্তুত, সভ্যতার ইতিহাসের সেই সুপ্রভাতের আলোকে আমরা মানবীয় শাসনের দিগন্তপ্রসারী অন্ধকার সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তখন পর্যন্ত মানব জাতির শাসন-ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কেবলমাত্র কঠোরতা ও বিভীষিকা সৃষ্টির পর্দায় আত্মগোপন করিয়া ছিল। সে যুগে সকলের চাইতে শ্রেষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন সবচাইতে ভয়ংকর প্রকৃতির। 'আশুর বনীপাল' নিনুয়ার শ্রেষ্ঠতম বাদশাহ ছিলেন এই কারণেই যে, শহর বিদগ্ধ করা এবং জনপদ ধ্বংস করার ব্যাপারে তিনি সবচাইতে অগ্রগামী ছিলেন।

বাবেলের দ্বিতীয় শাহী দাওরে বখতেনসর শ্রেষ্ঠতম দিগ্বিজয়ী বাদশাহ ছিলেন। তাহা এই জন্য যে, তিনি বিভিন্ন জাতির প্রতি নিষ্ঠুরতার চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের উপরে যে তাণ্ডব ধ্বংসলীলা তিনি চালাইয়াছিলেন জগতের ইতিহাসে উহার তুলনা মিলে না। মিসরী, আকাদী, ইলামী ও আশুরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাদশাহের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার তাহাদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল ছিল। অর্থাৎ যিনি যত বেশী অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন, তিনিই তত বড় বাদশাহ বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহারা দেবতাদের যোগাযোগে নরহত্যার তাণ্ডবলীলা চালাইয়া যাইতেন। সুতরাং জনসাধারণের উহার বিরুদ্ধে টু-শব্দ করিবার অধিকার থাকিত না। তাহারা সেই অমানুষিক অত্যাচারকে দেবতার বর বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইত। ইহাই ছিল সেই যুগের শাহানশাহবৃন্দের কৃতিত্ব বিচারের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি।

সাইরাসের আবির্ভাবের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বখতেনসরের শাহী বংশের অভ্যুত্থান ঘটে। আমরা দেখিতে পাই, বখতেনসর বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর তিনবার ভীষণভাবে আপতিত হইয়া শুধুমাত্র যে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ

সম্পদপূর্ণ এলাকা লুণ্ঠন করিলেন তাহাই নহে বরং ফেলিস্তিনের সমগ্র অধিবাসীগণকে এরূপভাবে তাড়াইয়া বাবেলে লইয়া আসিলেন যে, জুযী-ফাসের ভাষায় "কোন কঠিনতম প্রকৃতির কসাইও তাহার ভেড়াগুলিকে অত খানি নির্দয়তার সহিত কসাইখানায় লইয়া যায় না।" বিশ্বমানবতার এহেন সংকটময় মুহূর্তের চাহিদা কি ইহাই নহে যে, তাহাদের এক মুক্তিদাতা শাহানশার আবির্ভাব হউক? সকল জাতি কি মনে মনে তাহাই প্রার্থনা করে নাই? তাহারা কামনা করিতেছিল, এহেন চরম সংকটে মহাপ্রভু তাহাদের সাহায্যার্থে তাঁহার এমন কোন রাখাল ও মসীহকে প্রেরণ করুন, যিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাদের চরণের শৃংখল চূর্ণ করিবেন এবং করভার ও নিপীড়ন হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবেন। বিশেষতঃ দুনিয়াবাসীকে খোদার নির্দেশিত এই শিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবে যে, শাসনকার্য কেবলমাত্র মানব সেবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত; নিষ্ঠুরতার জন্য নহে।

সমগ্র দুনিয়া রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং উহা একজন আদর্শ চালক বা রাখালের জন্য অধীর-ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং হযরত ইয়াসইয়ার (আঃ) ভাষায় "খোদার সেই রাখালের আবির্ভাব হইয়াছিল।"

বস্তুতঃ, আমরা দেখিতে পাই "দুনিয়ার সকল জাতি তাঁহাকে শুধু গ্রহণই করে নাই; অধিকন্তু সাদর অভ্যর্থনার জন্য তাঁহার দিকে সকলেই ছুটিয়া গিয়াছিল।"— যীনোফোন)। কেননা তাঁহার আবির্ভাব সর্বতোভাবে যুগের চাহিদা মোতাবেক ছিল। সঠিক মুহূর্তেই তিনি দুনিয়ার মানব জাতির-মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। যদি রাত্রির তিমির অন্ধকারের পরে 'প্রভাতি-আলো'কে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে মানব দুর্গতির সেই গভীর অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাইয়া সৌভাগ্যের যে আলোকোজ্জ্বল সূর্য উদিত হইল, তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হইবে না কেন?

চিন্তা করিয়া দেখুন, হযরত ইয়াসইয়ার (আঃ) এই বর্ণনাটি কতই যথার্থ ছিল যে, "খোরেশ আমার রাখাল। সে আমার সকল উদ্দেশ্য সফল করিবে।

আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্বক অন্যান্য জাতিসমূহকে তাহার করতলগত করিয়া দিব। সকল বাদশাহর কক্ষই তাহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিব। আমি তাহার অগ্রভাগে থাকিব এবং তাহার চলার পথে সকল জটিলতা দূর করিয়া দিব।"

দুনিয়ার সকল ইতিহাসকার একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সাইরাস রাখালরূপেই জীবনযাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি খোদার বান্দাদের রাখাল সাজিয়া তাহাদিগকে সকল হিংস্র নরজাতির কবল হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি যেই দেশে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই দেশের অনাচারই নির্মূল হইয়াছে। তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে এবং যেইশ্রেণীর শিরোপরি হস্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের গুরুভারই হ্রাস পাইয়াছে। মোট কথা, তিনি শুধু বনী ইসরাঈলদের জন্য নহে; বরং সকল জাতির জন্যই মুক্তিদাতা ছিলেন।

স্মরণ থাকা প্রয়োজন, হযরত ইয়াসইয়া নবীর (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে তাহাকে "খোদার মসীহ" বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। "মসীহ" তাঁহাকেই বলা হয় যিনি আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে বিশেষ মর্যাদা ও বরকত লইয়া দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হন এবং যাহাকেই স্পর্শ করেন সে সুস্থ ও পবিত্র হইয়া ওঠে। যেমন, হযরত দাউদকে (আঃ) 'মসীহ' বলা হইত। সাইরাসকেও সেই উপাধিতে ভূষিত করা হইল। এইভাবে বনী ইসরাঈলদের মুক্তির জন্য এক শেষ মসীহর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। বস্তুতঃ, বনী ইসরাঈলগণ সাইরাসকে যে 'মসীহ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পবিত্রতা ও খোদা-দত্ত মর্যাদার পূর্ণ স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

(৭) কোরআনে জুলকারনায়েনের যে সর্বশেষ লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা হইল তাঁহার খোদায় বিশ্বাস। কোরআন এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ খোলাসা করিয়া দিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে: জুলকারনায়েন খোদাভক্ত ছিলেন। খোদার ফরমান অনুসারেই তিনি চলিতেন ও অন্যান্যকে চালাইতেন। অধিকন্তু নিজের সকল সাফল্যকে খোদার অনুগ্রহ ও দান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, সাইরাসের ভিতরে কি এইসব লক্ষণ বিদ্যমান ছিল ? সাইরাস সম্পর্কে উপরে বর্ণিত সকল কিছু পাঠ করিবার পরে কে বলিবে যে, তাঁহার ভিতরে সেসব লক্ষণ ছিল না ? ইয়াহুদিগণের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, খোদা স্বয়ং তাঁহাকে স্বীয় প্রেরিত 'মসীহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি ছিলেন ইসরাঈলী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক্ষিত পুরুষ। সুতরাং এ কথা না বলিলেও চলে, এহেন ব্যক্তি কিছুতেই খোদার নাফর-মান হইতে পারেন না। যাঁহার 'দক্ষিণ হস্ত স্বয়ং খোদাতায়ালা ধারণ করিয়াছিলেন' এবং যাঁহার 'জটিল পথকে তিনি সহজ করিয়া দিলেন নিশ্চয় তিনি খোদার প্রিয়পাত্র ছিলেন। খোদাতায়ালা শুধুমাত্র তাঁহারই হস্ত ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং সেই ধরনের লোককেই তিনি 'প্রেরিত' বলিয়া আখ্যাদান করেন, যিনি তাঁহার মনোনীত ও নির্দেশিত পথের অনুসারী।

ইসরাঈলী নবীদের সাক্ষ্য

অধুনা সমালোচক বন্ধুগণ হযরত ইস্রাসঈয়ার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর উপর সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। কেননা, উহা সাইরাসের আবির্ভাবের দেড়শত বৎসর পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু, উহা যদি বাদও দেওয়া হয়,তাহা হইলেও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না। কেননা, স্বয়ং সাইরাসের সমসাময়িক ইসরাঈলী নবীগণের সাক্ষ্যও বর্তমান রহিয়াছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ভিতরে অনুরূপ বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। এই জন্যই তাহারা সাইরাসের আবির্ভাবকে স্বাগতম জানাইয়াছিল।

হযরত হাযকীল (আঃ) ও হযরত দানিয়েল (আঃ) সাইরাসের সমসাময়িক নবী ছিলেন। তাঁহারা এমন কি সম্রাট দারায়ুসের রাজত্বকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সাইরাস সম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনাই রহিয়াছে। অতঃপর দারার সময়কার নবী হযরত হিজ্জি আঃ) ও হযরত যাকারিয়ার (আঃ) গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সম্রাট আর্দশিরের যুগে হযরত ওজরা (আঃ) ও হযরত নাহমিয়াহ (আঃ) আবির্ভূত হন। তাহাদের সাক্ষ্যসমূহও বর্তমান রহিয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ হইতে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হয় সাইরাস বনী ইসরাঈলদের জন্য প্রতিশ্রুত ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে মর্যাদা দানের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

যদি ইয়াহুদীদের সর্বসাধারণের এই বিশ্বাসই বদ্ধমুল ছিল, তাহা হইলে ইহা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে যে, তাহাদের সেই প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ একজন পৌত্তলিক হইবেন? ধরিয়া লউন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সাইরাসের আবির্ভাবের পরেই সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা তো ঠিক যে, সেগুলি ইয়াহুদীগণই সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইয়াহুদীদের ভিতরেই উহা ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছে। এমন কি উহা তাহাদের পবিত্র গ্রন্থে পর্যন্ত স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে

পারে যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য ছিল একজন পৌত্তলিক ? ইহা কি সম্ভবপর ছিল যে, জনৈক পৌত্তলিককে ইয়াহুদীগণ ওহীর মাধ্যমে প্রশংসিত ও নবীদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল ?

এই সত্যটিও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে, বিজাতি ও নবাগতদের প্রতি ইসরাঈলীদের বিদ্বেষভাব সর্বযুগেই তীব্রতর ছিল। তাহাদের বংশ গৌরবের ক্ষেত্রে ইহা হইতে মারাত্মক আঘাত আর কিছুই ছিল না যে, কোন অনৈসরাঈলীর মর্যাদাকে তাহারা স্বীকৃতি দান করিবে। ইসলামের আবির্ভাব কালেও তাহারা জ্ঞাত সত্যকে শুধু এই বলিয়া গোপন করিয়াছিল :

وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ

অর্থাৎ : যিনি তোমাদের ধর্মে বিশ্বাসী নহেন তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিও না। (কোরআন ৭৩ : ৩)

এতদসত্বেও তাহারা অপরিচিত সাইরাসের সম্মুখে নির্বিবাদে মাথা নত করিয়া দিল কেন ? এমন কি শুধু তাঁহাকে মানিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না; অধিকন্তু তাঁহাকে নবীদের প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বলিয়া স্বাগতম জানাইল।

অবস্থাদৃষ্টে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় সাইরাস ছিলেন তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার মর্যাদা ও গুণাবলী এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, উহা স্বীকার করিতে বনী ইসরাঈলের বংশীয় ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কোনরূপ প্রতিবন্ধক সাজে নাই।

এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য কোন বিধর্মী পৌত্তলিকের জন্য অন্ততঃ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের এতখানি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগিতে পারে না। যদি কোন পৌত্তলিক বাদশাহ তাহাদিগকে কোন বিপদ হইতে উদ্ধারও করিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার শাহী ঠাটের প্রশংসা করিত মাত্র। সেজন্য তাহারা কখনও তাঁহাকে খোদার 'মসীহ' বলিয়া ঐশ্বরিক মর্যাদা দান করিত না। অনুরূপ মর্যাদা লাভের জন্য অপরিহার্য যে, তিনি ধর্মপ্রাণ এবং বিশেষতঃ ইয়াহুদী ধর্মভুক্ত হইবেন। সমগ্র ইসরাঈলীদের ইতিহাসে যেহেতু অনৈসরাঈলীকে মর্যাদা দানের ঘটনা

একমাত্র ইহাই; সুতরাং সেই ব্যক্তি যে ধর্মের দিক হইতে কোন মর্যাদা লাভের যোগ্য ছিলেন না, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে না। এখন প্রশ্ন জাগে সাইরাসের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা কতটুকু কি জানিতে পারিয়াছি?

ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, সাইরাস যরদশতের শিষ্য ছিলেন। গ্রীকগণ তাঁহাকে 'যারদাস্তক' নামে অভিহিত করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইরানের সেই নবযুগের মূল উদ্‌গাতা ও প্রতিষ্ঠাতা তিনিই ছিলেন। তিনি শুধু মেডিয়া ও পারস্যের সম্মিলিত সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ কায়েম করিলেন, তাহাই নহে; অধিকন্তু তিনি পারস্যের প্রাচীন মজুসী ধর্মের স্থানে নূতন যরদশতী ধর্ম প্রবর্তন করিলেন। তিনি ইরানের নূতন রাষ্ট্র ও ধর্মের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন।

যরদশতের অস্তিত্বের ন্যায় তাঁহার আবির্ভাবকাল ও স্থান লইয়া ইতিহাসে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। এমন কি উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই মতানৈক্য ও জল্পনা-কল্পনা তাল-গোল পাকাইয়াছিল মাত্র। কেহ কেহ তাঁহার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একদল শাহনামার বর্ণনাকে গ্রহণ করতঃ গেশতাসপের কাহিনীকে সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একদল তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দ বলিয়াছেন। একদল খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার যুগ নির্দেশ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে তাঁহার জন্মস্থান লইয়াও ইতিহাসে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে বাখতারের, কেহ খোরাসানের, কেহ মেডিয়ার এবং কেহ আবার উত্তর-ইরানের অধিবাসী বলিয়া অভিমত পেশ করিয়াছেন। কিন্তু, বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে আসিয়া অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা গোল্ডনারের অভিমতকে সমর্থন জানাইয়াছেন। সাধারণভাবে এখন উক্ত মতকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তদনুসারে যরদশত এবং সাইরাস একই যুগের লোক ছিলেন। সেক্ষেত্রে শাহনামায় যে গেশতাসপের[১] বর্ণনা রহিয়াছে তাহা সত্য হইলে তদ্বারা সম্রাট দারার পিতা গেশতাসপকেই বুঝান হইয়াছে। তিনি ইরানের এক প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। আর যরদশতের জন্মস্থান ছিল

১ গ্রীকগণ গেশতাসপকে 'হিস্টাসেপ' লিখিয়াছেন।

উত্তর পশ্চিম ইরান অর্থাৎ আজারবাইজানে। অবশ্য তাঁহার মিশন সাফল্য-মণ্ডিত হয় বাখতার প্রদেশে এবং গেশতাসপ সেখানে গভর্ণর ছিলেন।[১]

উক্ত আধুনিকতম গবেষণার দ্বারা বুঝা যায়, যরদশতের মৃত্যু খৃষ্টের জন্মের ৫৮৩ হইতে ৫৫০ বৎসর কালের মধ্যেই হইয়াছিল। এদিকে সাইরাসের সিংহাসনারোহণ কাল নির্ধারিত হইয়াছে খৃঃ পূঃ ৫৫৯ অব্দ। সুতরাং সাইরাসের সিংহাসন লাভ যরদশতের মৃত্যুর বৎসরেই কিংবা উহার ৩৩ বৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

যদি সাইরাস যরদশ্‌ত একই যুগের লোক হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও সাইরাস যে যরদশতের ধর্মমত মানিয়া লইয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় কি? আদৌ নহে। কিন্তু, যদি ইতিহাসে বর্ণিত সাইরাস সম্পর্কিত সকল ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উহা হইতে সাইরাস ও যরদশতের মত ও পথের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র পরিলক্ষিত হয়। তাদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, সাইরাস শুধু যরদশতের ধর্মমতের প্রথম প্রচারক সম্রাট। অতঃপর তিনি তাঁহার দায়িত্বভার পরবর্তী বংশধরগণের উপর ন্যস্ত করিয়া গেলেন। তাঁহারা দুইশত বৎসর অবধি একাধারে যরদশতী ধর্মমতের অনুসরণ ও প্রচারকার্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে সর্বাধিক প্রামাণ্য ঘটনা দুইটি এবং সেই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতাও সর্ববাদীসম্মত। প্রথম ঘটনা "গুমাতা"র বিদ্রোহ। সাইরাসের মৃত্যুর আট বৎসর পরে উক্ত ঘটনা আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় ব্যাপার হইল দারার শিলালিপি। উহাতে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে।

এ ব্যাপারে সকল ইতিহাসকারগণ একমত, সাইরাস খৃঃ পূঃ ৫২৯ অব্দে দেহত্যাগ করেন। অতঃপর তৎপুত্র কেম্বিসেজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খৃঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে মিসর জয় করেন। তিনি মিসরে অবস্থান কালেই সংবাদ পাইলেন ইরানে, বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। "গুমাতা" নামক এক

---

১ এ ব্যাপারে আরও জানিতে হইলে কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. ভী. উইলিয়াম জেকসনের "Ancient Persia And His Prophet" গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করা দরকার।

ব্যক্তি নিজেকে সাইরাসের পুত্র 'সমরডেজ' বলিয়া পরিচয় দান করিয়া এই বিদ্রোহের সূত্রপাত করিল। সমরডেজ বহু পূর্বেই মারা গিয়াছিল অথবা তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। কেম্বিসেজ বিদ্রোহের খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ মিসর ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি ইরানের পথে সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াই হঠাৎ খৃঃ পূঃ ৪২৮ অব্দে ইন্তেকাল করেন।

যেহেতু সাইরাসের অন্য কোন পুত্র ছিল না, তাঁহার পিতৃব্য গেসতাসপের পুত্র দারা সিংহাসনে আরোহণ করেন। দারা সিংহাসন প্রাপ্তির পরে অল্প-দিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং গুমাতাকে হত্যা করিলেন। তিনি নূতন উদ্যমে রাজত্বকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাইলেন। দারার সিংহাসনারোহণ সর্ববাদী সম্মতভাবেই খৃঃ পূঃ ৪২৮ অব্দে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল সাইরাসের ইন্তেকালের আট বৎসর পরে শুরু হইয়াছিল।

গ্রীক ইতিহাসকারগণ সাক্ষ্য দান করিতেছেন, এই বিদ্রোহ পারস্যের প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল এবং দারা তাহার শিলা-লিপিতে "গুমাতা"কে "মোগোশ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার অর্থ মজুসী ধর্মমত দ্বারা প্রাচীন ধর্মমতকেই বুঝায়।[১]

ইতিহাসে এই রহস্যেরও সন্ধান মিলিতেছে যে, প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের বিদ্রোহ পরেও অব্যাহত ছিল। "পাউরভিশ" নামক এক মজুসী দ্বিতীয় বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল। দারা তাহাকে হামদানে হত্যা করেন। 'চিত্রৎখামা' নামক আর এক মজুসী বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাহাকে 'আওয়ারবীল' নামক স্থানে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি দারার শিলালিপিতে প্রকাশ পাইয়াছে। পৃথিবীর

---

১ মোগোস শব্দ 'আবেস্তা'র এক স্থানেও পাওয়া যায়। এ কথা এখন সুনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, "মোগোস" দ্বারা মেডিয়ার সেই ধর্মাবলম্বী-গণকে বুঝা যাইবে যাহারা যরদশতের পূর্বেকার ধর্মে বিশ্বাসী। যেহেতু মেডি-য়াবাসীগণ বাবেল এবং সিরিয়ায় "মোগোস" নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাই আরবেও তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিল। আরবীতে মোগোস শব্দ "মজুস" রূপ লাভ করিল। পরবর্তীকালে সমগ্র ইরানীগণকে 'মজুস' বলা আরম্ভ হইল। এমন কি যরদশতী ও গায়ের-যরদশতীর মধ্যে কোন পার্থক্য রাখা হইল না, মূলতঃ মজুসীগণ যরদশতীদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল।

মানুষের পক্ষে ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, দারার কতিপয় শিলালিপি পাহাড়ের গাত্রেও খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যাহার ফলে শাহ সেকান্দারের ধ্বংসলীলা হইতে উহা রক্ষা পাইয়াছিল। তন্মধ্যে বেস্তোঁর শিলালিপিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। উহাতে সম্রাট দারা তাঁহার সিংহাসন লাভ ও 'গুমাতা' মজুসীর বিদ্রোহ সম্পর্কিত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শিলালিপি হইল ইস্তাখারের। ইহাতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ সকল দেশের ও প্রদেশের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদুভয় শিলালিপিতে তিনি বারংবার "আহুরমুযদাহ" এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার সকল সাফল্য ও মর্যাদার মূল শক্তিরূপে তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং একথা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, দারা যরদশতী ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কেননা, উক্ত ধর্মের পরিভাষায় আল্লাহকেই বলা হয় "আহুরমুযদাহ"।

উপরোক্ত ঘটনাদ্বয়ের সহিত তৃতীয় একটি ঘটনা সংযোগ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ইতিহাসে এরূপ কোন ইংগিত পাওয়া যায় না যদ্দারা বুঝা যাইতে পারে, কেম্বিসেজ কোন নূতন ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি দারাও যে তাঁহার পূর্বপুরুষের ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ কোন তথ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসকার হিরোডোটাস দারার মাত্র ষাট বৎসর পরে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার জন্ম দারার জীবনের ঘটনাবলী খুবই নিকটবর্তী সময়কার ছিল। অধিকন্তু লিডিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উভয় দেশের সম্পর্কও তখন দিন দিন ঘনিষ্ঠতর হইয়া চলিয়াছিল। তাঁহার ইতিহাসে অনুরূপ কোন ঘটনা দেখা যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত যে, সাইরাসের মৃত্যুর পর হইতে দারার সিংহাসন লাভ পর্যন্ত উক্ত রাজবংশে ধর্মমতের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এখন চিন্তা করিয়া দেখেন, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা শেষ সিদ্ধান্ত কি গ্রহণ করিতে পারি?

যদি সাইরাসের মৃত্যুর পরে কেম্বিসেজ ও দারা কোন নূতন ধর্মমত গ্রহণ না করিয়া থাকেন এবং সেক্ষেত্রে যদি দারাকে যরদশতী ধর্মমতের অনুসারী বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহা হইলে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে,

সাইরাসের প্রতিষ্ঠিত শাহী খানদানের ধর্মমতই ছিল যরদশতী? যদি সাইরাসের মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পরেই প্রাচীন ধর্মানুসারী দল সাইরাস রাজবংশের ধর্মমত পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি ইহা প্রমাণিত হয় না, সাইরাস অবশ্যই নূতন কোন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? সেক্ষেত্রে যদি যরদশত সাইরাসের সমসাময়িক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি ইহা বুঝা যায় না, প্রথমে তিনি যরদশতী ধর্মের অনুসারী হইয়াছিলেন? আরও প্রমাণিত হয় যে, পারস্য ও মেডিয়ার বাদশাহ হিসাবে তিনি প্রথম উক্ত ধর্মের প্রচারক সম্রাট সাজিলেন।"

দারার তিরোধানের সর্ববাদীসম্মত কাল হইল খৃঃ পূঃ ৪৮৬ এবং হিরোডোটাস জন্ম গ্রহণ করেন খৃঃ পূ ৪৮৪ অব্দে। অর্থাৎ দারার মৃত্যুর মাত্র দুই বৎসর পর তাঁহার জন্ম হয়।

যরদশত ও সাইরাস

সাইরাস যরদশতের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা করা হইয়াছে তাহাই শেষ নহে। অধিকন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাহাদের ঘনিষ্ঠতার শৃঙ্খল উত্তরোত্তর অধিকতরভাবে তাহাদিগকে জড়াইয়া চলিয়াছে। অবশ্য সে চিন্তাধারাকে আমরা অনুমান ছাড়া অন্য কিছু বলিতে সাহসী হইব না। যদি সাইরাস ও যরদশত সমসাময়িক কালের প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়া থাকেন এবং সাইরাসের প্রাথমিক জীবন পরিবার হইতে দূরে কোন নিরুদ্দেশ স্থানে অতিবাহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সময়টিতে তাঁহারা পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নাই কি? সেক্ষেত্রে এমন অনুমান অমূলক হইবে না যে, সন্ন্যাসী যরদশতের আশ্রমই নির্বাসিত রাজপুত্রের শিক্ষা শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, সাইরাসের প্রাথমিক জীবনের ঘটনাবলী ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় বৈ নহে। এখন আমরা সেই অজ্ঞাত কালটিকে উভয় মনীষীর সাহচর্যের যুগ ধরিয়া উক্ত রহস্যের দ্বারোদঘাটন করিলে কি তাহা অযৌক্তিক হইবে? তাঁহাদের সমসাময়িকতার এতটুকু পরিণতিও কি অসম্ভব?

ইতিহাসকার যীনোফোন সাইরাসের প্রাথমিক জীবনের কাহিনী আমাদিগকে কিছুটা শুনাইয়াছেন। উহাতে আমরা তাঁহার তৎকালীন জীবনের এক রহস্যময় ব্যক্তির প্রভাব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাই। যদ্দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, পাহাড়-পর্বতের সেই প্রকৃতি পালিত বালককে তাঁহার ভাবী জীবনের অসাধারণ কার্যাবলীর জন্য গড়িয়া তোলা হইতেছিল। আমরা তাঁহার জীবনের সেই অভিনব প্রভাবের ভিতরে স্বয়ং যরদশতের পবিত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখিতে পাই না কি? যদি যরদশতের আবির্ভাব উত্তর-পশ্চিম ইরানে হইয়া থাকে এবং সাইরাসের প্রাথমিক নিরুদ্দেশ জীবনও যদি সেখানকার পার্বত্য অঞ্চলে অতিবাহিত হইয়া থাকে, তাহা

হইলে এতদুভয়ের তৎকালীন রহস্য একই সূত্রে মিলিত হইয়া এক অজ্ঞাত ইতিহাসের সন্ধান দিবে না কেন?

সাইরাসের ব্যক্তিত্ব যে যুগের প্রচলিত সকল চিন্তাধারা ও সর্বপ্রকার চরিত্রাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত এক বিস্ময়কর বিপ্লবী খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এরূপ ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যাদুস্পর্শের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখন আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, তাহার সময়ে অনুরূপ একজন মহাপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন এবং তিনি হইলেন যরদশত।

যাহা হউক, সাইরাস তাঁহার নির্বাসিত জীবনে যরদশতের শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে ধন্য হইয়া থাকুন কিংবা সিংহাসনে আরোহণের পরেই হউন, মূলতঃ তিনি যে যরদশতী ধর্মের অনুসারী ছিলেন তাহা আমরা ইতিহাসের আলোকেই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছি।

যরদশতী ধর্মের মূল শিক্ষা

যদি জুলকারনায়েন যরদশতী ধর্মাবলম্বী হইয়া থাকেন এবং কোরআন তাঁহার খোদা ও আখেরাতের বিশ্বাস সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে, এমন কি তাঁহাকে এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করে, তাহা হইলে ইহা কি অপরিহার্য নয় যে, যরদশত সত্য ধর্মের শিক্ষাই দান করিয়াছিলেন? সুনিশ্চিতভাবে ইহাই অপরিহার্য দাঁড়ায়। আর সেই অপরিহার্যতা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালাইবারও কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা, এ কথা আজ দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, যরদশতের শিক্ষা আগাগোড়া একমাত্র খোদার এবাদত ও সৎকাজের নির্দেশ সম্বলিত ছিল। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যরদশতী ধর্মে অগ্নি পূজাদির যে ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা কি ভাবে সত্যধর্মে স্বীকৃতি লাভ করিল? জওয়াব এই, সেই সব অনাচার যরদশতের শিক্ষায় ছিল না; বরং উহা পরিবেশের প্রভাবে মজুসী ধর্ম হইতে সত্যধর্মে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। এরূপ প্রমাণ আমরা খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাসেও দেখিতে পাই। যেমন, ঈসায়ী ধর্মে পরবর্তীকালে রোমের প্রাচীন পৌত্তলিকতা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কোনক্রমেই উহার কবল হইতে ঈসায়ী

ধর্ম রক্ষা পায় নাই। তদ্রূপ যরদশতের নিছক খোদাপরস্তির শিক্ষাও প্রাচীন মজুসী ধর্মের প্রভাব হইতে নিস্তার পায় নাই। বিশেষতঃ সাসানী শাহান-শাহদের যুগে যখন উহাকে নূতন ভাবে সংস্কার ও প্রবর্তন করা হইল, তখন মূল ধর্ম বিকৃত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিল।

যরদশতের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্য ও মেডিয়াবাসীদের প্রকৃতি ঠিক ইন্দো-ইউরোপীয়ান আর্যদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ন্যায়ই ছিল। হিন্দুস্থানে আর্যদের ন্যায় ইরানের আর্যদের মধ্যেও প্রথমে স্রষ্টার প্রাকৃতিক লীলাপুঞ্জের পূজা-পার্বণ শুরু হয়। অতঃপর ক্রমে তাহাদের ভিতরে সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কল্পনার সৃষ্টি হইল। তৎপরে পৃথিবীর বুকে অগ্নিকে উহার স্থলাভিষিক্ত মনে করিতে লাগিল। সুতরাং পূজা পাইবার যোগ্যতা শেষ পর্যন্ত অগ্নির ভিতরে সীমাবদ্ধ হইল। কেননা; সমগ্র জড় উপাদান উহা হইতেই আলো ও তাপ গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করে।

গ্রীকগণের ভিতরে দেবতা সম্পর্কে এই বিশ্বাস গড়িয়া উঠিল, মানুষের ভাল ও মন্দ উভয় অবস্থাই দেবতাদের তরফ হইতে দেখা দেয়। কিন্তু ইরানীদের কল্পনায় দেবতার ধারণা ছিল অন্যরূপ। তাহারা দেবতাকে দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তিরূপে ধারণা করিত। একটি পুণ্যাত্মা অপরটি পাপাত্মা। দুনিয়ার মানবের যত সুখ-শান্তি ও কল্যাণ পুণ্যাত্মা শক্তির বদৌলতে হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রেতাত্মা শক্তিই দুনিয়ার সকল অশান্তি ও অন্যায়ের মূল। পুণ্যাত্মা শক্তির বিকাশ ঘটে আলো রূপে আর জমাট অন্ধকার হইল পাপাত্মা বা ভূত-প্রেতের স্বরূপ। আলো ও আঁধারের এই টানা-পোড়েন ও সংঘাতেই সৃষ্টি হয় ভাল-মন্দ বা মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছু। যেহেতু আলো পবিত্র বা পুণ্যাত্মা শক্তির বাহ্যিক রূপ, তাই সর্বপ্রকার পূজা-পার্বণ ও ত্যাগ সাধনা উহারই জন্য করা উচিত। সেই আলোর উৎস আকাশের বুকে সূর্য এবং ধরাপৃষ্ঠে অগ্নি। সুতরাং ইরানীদের পূজা-পার্বণ অগ্নিদেবতার ভাগ্যেই জুটিত।

অবশ্য তাহাদের ভাল-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের এই কল্পনা গ্রীকদের ন্যায় পার্থিব জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরেই নির্ভরশীল ছিল। আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ভাল-মন্দের কোন চিন্তাধারাই তাহাদের মধ্যে

ছিল না। অগ্নি-পূজার 'উৎসর্গ স্থল' বা বেদী গড়িয়া তোলা হইত এবং উহার পূজা-পার্বণ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য একটি বিশেষ দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগকে বলা হইত "মোগোস"। পরবর্তী কালে উক্ত পরিভাষা 'অগ্নি-উপাসক' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া চলিল। কিন্তু যরদশত্ উক্ত বিশ্বাস-সমূহের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি খোদা-পরস্তি আত্মিক ভাল-মন্দ ও পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাস গড়িয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন: এই জগতে মঙ্গলের জন্য কোন আত্মিক সত্তার অস্তিত্ব নাই। তদ্রূপ অমঙ্গলের জন্য কোন প্রেতও অবস্থান করে না। শুধু মাত্র এক "আহুরমুযদাহ"ই সর্বত্র বিরাজমান। তিনি পরম আত্মীয়, তিনি আলো, তিনি পবিত্র তিনি সত্য, তিনি জ্ঞানী, তিনি শক্তিমান এবং তিনিই নিখিল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। এমন কোন সত্তা নাই যাহা তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে; তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারে কিংবা তাঁহার অংশীদার সাজিতে পারে। তোমরা যেই আত্মিক সত্তাকে মঙ্গলের স্রষ্টা কল্পনা করিয়াছ, তিনি মূলতঃ কোন স্রষ্টা বা শক্তিমান নহেন বরং তিনি সেই "আহুরমুযদার" ই সৃষ্ট "আমসহপন্দ" অর্থাৎ ফেরেশতা। আর অমঙ্গল ও অনাচারের মূল হিসাবে যাহাকে ধারণা করিয়াছ, সেও কোন দৈত্যাকায় ভয়ংকর শক্তি নহে; বরং তাহাকে বলা হয় 'আহর-মান' বা শয়তান। সে ধোকা দিয়া মানুষের অন্ধকার পথে চালিত করে।

যরদশতের এই শিক্ষার বাস্তব দিকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীকদের ন্যায় তিনি ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া কোন চারিত্রিক চিন্তাধারা প্রবর্তনের ব্যর্থ প্রয়াস পান নাই। তিনি ধর্মকে কেবল মাত্র দেশ ও জাতির একটি মুখোশ হিসাবেও ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হন নাই, বরং ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন কর্মসূচী রূপে প্রবর্তন করিলেন। আত্মার পবিত্রতা ও কার্যের সততা তাহার শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল। মানব জীবনের প্রত্যেকটি কথা ও কাজে পরিমাপ থাকা অপরিহার্য। চিন্তাধারার সাম্য, কথার সততা এবং কাজের সততা এই তিনটি তাহার মতে আহুরমুযদার মূলনীতি। অধ্যাপক গ্রান্ডির কথায় বলা চলে; তাঁহার ধর্মমত সত্য ও কাজ এই দুইটির উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রীকদের ধর্মের ন্যায় উহা কেবলমাত্র কতিপয় সংস্কার

ও রীতির সমষ্টি ছিল না। তিনি ধর্মকে ইরানীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন এবং চরিত্র ছিল সেই ধর্মের মূল উপাদান।

তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি সংপ্রকারের পৌত্তলিক প্রভাব মুক্ত ছিল। তিনি বলেন: আমাদের উপাসনা এইজন্য হওয়া উচিত নহে যে, শুধুমাত্র খোদার গজব ও প্রতিদান হইতে নিস্তার লাভ করিব; বরং যাহাতে উভয় জগতে পুণ্য ও সফলতা লাভ করিতে পারি তজ্জন্যই উপাসনার প্রয়োজন। যদি আমরা আহুরমুযদার উপাসনা না করি, তিনি আমাদিগকে ভারত ও গ্রীক দেবতাদের ন্যায় কোপানলে ভস্মীভূত করিবেন না; বরং আমরা পূত জীবন হইতে বঞ্চিত থাকিব।

তাঁহার শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হইল আখেরাতে অটল বিশ্বাস। তিনি বলেন: মানব জীবন শুধু এতটুকুই নহে যতটুকু আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই। উহার পরেও তাহারা আরেক জীবনের সম্মুখীন হইবে। সেই জীবনে দুইটি জগতের সৃষ্টি হইবে। এই জগৎ পুণ্য ও সফলতার, অপর জগত হইবে পাপ ও ব্যর্থতার, যাহারা এই জীবনে পুণ্য কাজ করিবে, তাহারা প্রথম জগতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা পাপ কার্য করিবে, তাহারা দ্বিতীয় জগতে প্রবেশ করিবে। আর তাহাদের সেই ভাগ্য নির্ধারণ হইবে "শেষ দিবসে"।

আত্মার অবিনশ্বরতা তাঁহার ধর্মের মূলনীতি। মানব মরণশীল বটে; কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই। মানুষের মৃত্যুর পরেও আত্মা বাঁচিয়া থাকে। পুরস্কার কিংবা শাস্তির যে কোন এক জগতে উহা প্রবেশ করে।

বর্তমান যুগের সকল ইতিহাস বিশারদদের সর্বসম্মত অভিমত এই, যরদশতের শিক্ষা মানব চরিত্র ও চিন্তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইরানীগণকে চরিত্রের পবিত্রতার ক্ষেত্রে এমন এক স্তরে পৌঁছাইয়াছিলেন যেখান হইতে তাহাদের সমসাময়িক গ্রীক ও রোমকগণের জীবনধারা অনেক নিম্নস্তরের বলিয়া প্রতিভাত হইত। যে ধর্মের আগাগোড়া শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের পবিত্রতা সাধনের নিমিত্ত ছিল ও স্বীয় অনুসারীদের চারিত্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিত, সেই ধর্মের শিক্ষা অবশ্যই কার্যপদ্ধতি ও আচার-আচরণের উত্তম ছাঁচে ঢালিয়া প্রবর্তন করা হইয়াছিল।

ইতিহাস তাহাই সাক্ষ্য দেয়। এই সাক্ষ্য কাহাদের কলম হইতে প্রকাশ পাইল? যাহারা কোনদিনই ইরানীদের বন্ধু ছিলেন না—উহা তাহাদের কলম হইতেই বাহির হইয়াছে। খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দী পুরাপুরি ভাবে ইরানী ইউনানীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগকাল ছিল। বিশেষতঃ হিরোডোটাস ও যীনোফোন যখন ইতিহাস লিখেন, তখন গ্রীকদের ইরানীদের প্রতি শত্রুতার ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই, তাহারা ইরানীদের চারিত্রিক উন্নতমানের স্বীকৃতি দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, ইরানীদের কেহ কেহ এত অধিক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন যাহার তুলনা গ্রীসে মিলে না। আমরা এক্ষেত্রে অধ্যাপক খান্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে পারি। তিনি বলেন:

"ইরানীদের সততা ও ধর্মপরায়ণতার গুণাবলী এত অধিক ছিল যে, সেই যুগের কোন জাতির ভিতরে তাহার তুলনা মিলিত না।"

তাহাদের সত্যবাদিতা, দয়া, বীরত্ব ও উন্নতভঙ্গীর স্বীকৃতি একবাক্যে সকলেই দান করিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহা নিশ্চিতভাবে যরদশতী শিক্ষার অনিবার্য ফল ছিল।

দারার ফরমান

প্রথম দারার যুগ যরদশতী ধর্মের চরম উন্নতির যুগ ছিল। তাঁহার শিলালিপি আমাদিগকে যরদশতী ধর্মমতের প্রতিধ্বনি শ্রবণ করাইতেছে। সেইগুলি হইতে আমরা ধর্মের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে সমর্থ হই। ইস্তাখারের শিলালিপিতে আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের সেই আওয়াজ আজও প্রতিধ্বনিত হইতেছে:

"মহা সম্মানিত খোদা হইলেন আহুরমুযদাহ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন: আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন: মানবের সৌভাগ্য তাঁহারই অবদান; তিনিই দারাকে বহু জাতির একচ্ছত্রাধিপতি শাহানশাহ এবং বিধানকর্তা করিয়াছেন।"

দারা ঘোষণা করিতেছেন:

"আহুরমুযদাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে বাদশাহী দান করিয়াছেন। তাঁহারই দয়ায় আমি পৃথিবীর বুকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমি আহুরমুযদার নিকট প্রার্থনা করিতেছি: আমাকে, আমার

পরিবারবর্গকে এবং অধীনস্থ সকল দেশকে রক্ষা কর। ওগো আহুরমুযদাহ! আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর!"

"হে মানব! তোমাদের উপর আহুরমুযদার নির্দেশ এই: পাপের চিন্তাও করিও না। সরল পথ ত্যাগ করিও না। অন্যায় হইতে দূরে থাক।'

স্মরণ রাখা দরকার, দারা ও সাইরাস প্রায় সমসাময়িক লোক ছিলেন। অর্থাৎ সাইরাসের মাত্র আট বৎসর পরে দারা সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং দারার আওয়াজের ভিতরে আমরা স্বয়ং সাইরাসের আওয়াজ শুনিতে পাই। তাহার স্বীয় সাফল্যের জন্য বারবার আহুরমুযদার অনুগ্রহকে নির্দেশ করার ভিতরে আমরা জুলকারনায়েনের এই সুরই শুনিতে পাই:

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

(ইহা আমার প্রভুর অনুগ্রহ বৈ নহে)

কিন্তু খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতেই যরদশতী ধর্মের পতন শুরু হয়। একদিকে প্রাচীন মজুসী ধর্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল, অপর দিকে বাহিরের প্রভাবও উহার উপর মারাত্মক আঘাত হানিতে লাগিল। এমনকি রোম সম্রাট এন্টোনাইনের যুগে যরদশতী ধর্মমত সম্পূর্ণ বহুরূপ ধারণ করিল। অতঃপর সেকান্দার-ই-আজমের দিগ্বিজয়ের প্লাবন শুধুমাত্র ইরানের দুইশতাব্দীর প্রাচীন শাহী বংশই ধ্বংস করে নাই, তদুপরি উহার ধর্মমতও ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। ইরানের জাতীয় কাহিনী পাঠে অবগত হওয়া যায়, যরদশতের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তা' বার হাজার বলদের চামড়ার উপর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল এবং সেকান্দারের ইস্তাখার আক্রমণকালে উহা দগ্ধীভূত হয়। অবশ্য বার হাজার বলদের খালের কাহিনী অতিরঞ্জিত রূপকথা বলিয়া মনে হয়। তবে এ কথা সত্য, বখ্‌তে নসরের বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণের ফলে তৌরাতের যে দশা ঘটিয়াছিল, সেকান্দারের ইরান আক্রমণের ফলে 'আবেস্তা'র সেই দশাই দেখা দিয়াছিল। অর্থাৎ উভয় দিগ্বিজয়ী বাদশাহই উভয় স্থানের ধর্মমতের মূল গ্রন্থ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

অতঃপর পাঁচশত পঞ্চাশ বৎসর পরে ইরানে সাসানীয়দের শাসনকাল আরম্ভ হইলে, যরদশতী ধর্মকে নূতনভাবে গড়িয়া তোলা হইল এবং যেভাবে বাবেল অবরোধের অবসান ঘটিবার পরে হযরত ওযরা নূতন ভাবে তৌরাত সংকলন করিলেন, তদ্রূপ আর্দেশীর বাবোকানী নূতনভাবে আবেস্তা প্রণয়ন করাইলেন। ইহার ফলে যরদশতী ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ধারায় পড়িয়া লোপ পাইল। বস্তুতঃ দেখা যায়, সাসানীয়দের দ্বারা পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত যরদশতী ধর্ম মূলতঃ প্রাচীন মজুসী, যরদশতী ও গ্রীক ধর্মের এক জগাখিচুড়ী বৈ কিছুই নহে। বিশেষতঃ উহার বাহ্যিক রূপ ও রং তো সম্পূর্ণ মজুসীদেরই ছিল। ভারতের পার্সিয়ানদের মাধ্যমে আমরা যে 'আবেস্তা'র সন্ধান পাইয়াছি উহা সাসানীয়দের সেই পরিবর্তিত ও বিকৃত সংস্করণের একটি অংশ মাত্র। আর সেই খণ্ড উদ্ধারের ব্যাপারে আমরা এক ফরাসী প্রাচ্যবিদের অপরিসীম ধৈর্য ও গবেষণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই ব্যাপারে আরেকটি বুঝিবার বিষয় রহিয়াছে। সে ব্যাপারেও কিছুটা আলোকপাত প্রয়োজন। ইহা সর্বজনস্বীকৃত কথা, যরদশতের শিষ্যদের মধ্যে পৌত্তলিকতার কোন রূপই আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। প্রাচীন মজুসী ধর্মেও উহার কোন সন্ধান মিলে না। কিন্তু ইরান সম্রাট দারার এবং তাঁহার পরবর্তিকালের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে একটি বিশেষ প্রতিমূর্তির নমুনা পাওয়া গিয়াছে। উহা কোন বাদশাহর চিত্র হইতে পারে না। কেননা বাদশাহর প্রতিমূর্তি সেই নকশায় পৃথকরূপে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেই প্রতিমূর্তিটি উর্ধ্বভাগে পৃথকভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে এবং সকল কিছুর উর্ধ্বেই উহা স্থানলাভ করিয়াছে। এইজন্য ইহা অপরিহার্য যে, স্বয়ং বাদশাহ হইতেও উহা কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি হইবে। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়াছে, উহা কোন ব্যক্তি? প্রথমত এই প্রতিমূর্তি 'বেস্তা'র নকশায় ধরা পড়িয়াছে।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্নেল রাওলিনসন ব্যাখ্যা ও মন্তব্যসহ মূল নকশার চিত্র প্রকাশ করেন। অতঃপর কতিপয় নকশার ভিতরেই উহার নমুনা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে দারার সরকারী

মুদ্রার নক্‌শায়, দারার কবরে প্রতিষ্ঠিত রুস্তমের নক্‌শায় ও ইস্তাখারের শাহী মহলের মধ্যবর্তী দরজায় অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা গিয়াছে।

রালিনসনের পূর্বে স্যার রবার্ট কেয়াপোর্টার এই অভিমত প্রকাশ করেন, ইহা কোন অতিমানবের প্রতিমূর্তিই হইবে। এমনকি তিনি স্বয়ং বাদশাহ্‌ হইতেও উর্ধ্বতন কেহ হইবেন। রালিনসন উহা হইতে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ইহা আহুরমুযদারই প্রতিকৃতি অর্থাৎ স্বয়ং খোদার প্রতিমূর্তি। সেই হইতে উক্ত অভিমতই স্বীকৃত হইয়া চলিল। এখন সাধারণভাবে সকলেই এই কথা মানিয়া লইয়াছে; যদিও ইরানীগণ পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাকিত, তবুও তাহারা 'আহুরমুযদার' একটি প্রতিমূর্তি নমুনাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং বাদশাহ্‌গণের প্রতিমূর্তির সংগে তাঁহারই ছবি অংকিত হইয়াছে। আর ইহা ছিল আশুরীয় ও মিশরীয়দের খোদাই শরীরী নমুনা প্রতিষ্ঠারই প্রভাব।[১]

কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন আমি সর্বপ্রথম ইরানের পৌরাণিক নির্দেশনাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিলাম, সেই হইতে আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম, উক্ত ধারণা প্রথম দিবস হইতেই ভ্রান্তপথে চালিত হইয়া আসিতেছিল এবং সকল ইতিহাস ও গবেষণা উহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রথমতঃ, ইতিহাসের বর্ণনা ও পার্সিয়ানদের ধারাবাহিক কার্যধারা প্রমাণ করে, তাহারা খোদার কল্পনা কোনদিনই কোন মানবীয় দেহাকৃতিতে করে নাই এবং কোনদিনই কোন প্রতিমূর্তিকে সম্মানের চোখে দেখে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কালের দীর্ঘতা অনুরূপ কোন কিছু সৃষ্টিও করিয়া থাকে, তবুও এ কথা বুঝা কঠিন যে, সম্রাট দারার যুগে ইহা হইল কি করিয়া? উহা তো যরদশতের শিক্ষার প্রথম যুগ ছিল। অধিকন্তু, গ্রীক ইতিহাসকারগণ সাক্ষ্য দান করিতেছেন, ইরানীগণ গ্রীকদের পৌত্তলিকতাকে ঘৃণার চোখে দেখিত।

তৃতীয়তঃ, উক্ত নকক্‌শায় এমন কিছুই নাই যদ্দ্বারা উহাকে ঐশ্বরিক কিংবা পুজনীয় কিছু মনে করা যাইতে পারে। সর্বত্রই উহার এক রং ও

১ গ্রন্থকারের One Primeval Language পড়ুন।

আকৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং উহা সাধারণ মানুষের চিত্রবৎ দেখা যায়। এমনকি উহার পোশাকাদিও একজন সাধারণ মানুষের মাত্র। তাহার সেই পোশাক স্বয়ং দারা ও তাহার উত্তরাধিকারীগণের পোশাকের মতই মনে হয়। শুধু ব্যতিক্রম এতটুকু, উক্ত চিত্রের কোমরের চতুষ্পার্শে একটি বেড়ির মত দেখা যায় এবং উহার পশ্চাদভাগে তরঙ্গের ন্যায় সুদীর্ঘ একটি রেখা রহিয়াছে। সেই বৃত্ত ও ঢেউকে সূর্যের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করা হয়। যদি এই ধারণা স্বীকার করিয়াও লওয়া হয়, তাহা হইলেও এই প্রমাণ যথেষ্ট নহে যে; একটি বৃত্তের আকৃতি ও তরঙ্গের নমুনা দ্বারা কোন স্রষ্টার কল্পনা করাই যরদশতের শিষ্যদের চিন্তার দৌড় ছিল।

চতুর্থতঃ, যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, উক্ত বৃত্ত ও তরঙ্গের পিছনে কোন অতি মানবীয় চিত্রই কল্পিত হইয়াছে, তাহা স্বয়ং আহুরমুযদার চিত্র হইবে কেন? তাঁহার সম্পর্কে তো যরদশত তাহাদের ধারণা অত্যন্ত উঁচু স্তরে পৌঁছাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উহা এমন এক মানবের প্রতিকৃতি হইবে না কেন, যিনি মানব হওয়া সত্বেও তাহার সম্পর্কে সকলের ধারণা ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও উন্নত। সেরূপ খোদা প্রেরিত এক অসাধারণ মানুষের চিত্রও তো উহা হইতে পারে?

যাহা হউক, এই দিকে আমরা যতই অগ্রসর হই, এ কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, উহা আহুরমুযদার আকৃতির সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। ইহা হয় স্বয়ং যরদশতের আকৃতি; যিনি ইরানীদের নব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অথবা সম্রাট সাইরাসের যিনি শাসক, নবী ও হেখামেনেশী শাহী বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন।

যেহেতু উক্ত চিত্রটির বাম হস্তে সকল নকশায়ই একটি বৃত্ত দেখান হইয়াছে এবং প্রাচীন যুগে বৃত্তাকৃতি দ্বারা রাজত্ব ও প্রভুত্বের চিহ্ন বুঝা হইত, এইজন্য উহাকে সাইরাসের চিত্র বলিয়া মনে করাই অধিকতর স্বাভাবিক।[১]

১ ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে আমি আমার এই গবেষণা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'ফারসী ভাষার ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা এডওয়ার্ড ব্রাউনকে লিখিয়া জানাইয়াছিলাম। তিনিও আমার সহিত এ ব্যাপারে একমত হইয়া বিশেষ জোর দিয়া লিখিয়াছিলেন, প্রাচ্য সম্পর্কে গবেষণারত জার্মান পণ্ডিতদের নিকট যেন আমি এই সম্পর্কে লিখিয়া পাঠাই। অতঃপর কিছুদিন পরে তিনি আমাকে লিখিয়া জানাইলেন; তিনি নিজেই

জুলকারনায়েন কি নবী ছিলেন ?

কোরআনের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষণে মাত্র আরেকটি প্রশ্নের সমাধান অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোরআনে আমরা দেখিতে পাই, স্বয়ং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :

(আমি বলিলাম : হে জুলকারনায়েন।)

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ

এই সম্বোধনের অর্থ কি ?

উহার অর্থ কি এই, জুলকারনায়েন সরাসরি খোদার ওহী লাভ করিতেন ? তাফসীরকারকগণ এখানে আসিয়া স্ব-স্ব খেয়ালখুশির কসরৎ চালাইয়াছেন। আর যেহেতু ইমাম রাযী সেকান্দর মাকদুনীকে জুলকারনায়েন স্থির করিয়াছিলেন, অথচ তাহা কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না, অগত্যা তিনি এখানে আসিয়া 'কুলনা' শব্দের অর্থের উপর উহার ভাবার্থকে স্থান দান করিয়া কোনমতে হাঁপ ছাড়িলেন। ইহাতে সন্দেহ নাই 'কুলনা'-এর তাৎপর্য ইহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, এই সম্বোধন কাহারও মাধ্যমে করা হইয়াছে। অর্থাৎ সেই যুগের কোন নবীর মাধ্যমে জুলকারনায়েনকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যেমন, কোরআন শরীফের অন্য একস্থানে রহিয়াছে :

فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا

(আমি বলিলাম : উহার কিছু অংশ দ্বারা বাকী অংশের উপরে আঘাত কর।)

অথবা উক্ত সম্বোধন 'কওলী' না হইয়া 'তাক্‌বিনী' হইতে পারে। অর্থাৎ সম্বোধনের ফল কাজের মাধ্যমে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, মৌখিক

তাহাদের সংগে ইহা লইয়া লেখালেখি শুরু করিতেছেন। ইহার পরেই মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। সেন্সরের সুকঠিন প্রাচীন চিঠিপত্রের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। ইতিমধ্যে আমাকে নজরবন্দী করা হইল। যখন মুক্তি পাইলাম তখন শুনিলাম তিনি মারা গিয়াছেন।

করা হয় নাই। যেমন, কোরান শরীফে কোন কোন স্থানে অনুরূপ সম্বোধন দেখা যায়:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

(বলিলাম: হে অগ্নিকুণ্ড। শীতল হও এবং ইবরাহিমের উপর আমার শান্তি বর্ষিত হউক)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে বুঝা যায়, কোন কার্য সম্পাদিত হওয়ার উদ্দেশ্যেও সম্বোধন হইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইতে তজ্জন্য বিশেষ কারণ ও পরিবেশের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এখানে অনুরূপ অর্থ গ্রহণের কোন কারণই বিদ্যমান নাই। এখানে আয়াতের পরিষ্কার তাৎপর্য এই, জুলকারনায়েনকে আল্লাহতায়ালা সরাসরি সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর আল্লাহতায়ালার ওহী নাযিল হইয়াছিল।

এখন বুঝিবার ব্যাপার এই, সেই ওহী কোন ধরনের? নবীদের উপর যে ওহী নাযিল করা হইত ইহা কি তদ্রূপ ওহী, না হযরত মুসার (আঃ) জননীর নিকট যে ওহী আসিত বলিয়া কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে তদ্রূপ ওহী?

সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাথমিক যুগের বুযুর্গদের ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায়, জুলকারনায়েন নবী ছিলেন। অধুনা ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁহার যোগ্যতম শিষ্য হাফেজ ইবনে কাসীরও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

এখন ভাবিবার বিষয় যে, কোরআনের বর্ণনা সাইরাসের ক্ষেত্রে কি ভাবে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে! ইতিহাস তাঁহার পয়গাম্বরসুলভ ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্য দান করিতেছে এবং প্রাচীনকালের নবীগণ তাঁহাকে খোদার নিকট সম্মানিত, তাঁহার মসীহ ও ইচ্ছা পূরণকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হযরত ওযরার (আঃ) গ্রন্থে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে তাঁহার যে ফরমান উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনি স্বয়ং ঘোষণা করিতেছেন: খোদাতায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যেন ইয়াহুদীর দেশে তাহাদের বন্দেগীর জন্য আমি একটি উপাসনালয় নির্মাণ করিয়া দেই।

এক্ষণে দেখা যায়, তাঁহার এই কথা "খোদা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন" এবং খোদার বাণী "আমি বলিলাম : হে জুলকারনায়েন" তাৎপর্যের দিক হইতে হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। কেননা, খোদা যে তাঁহাকে সরাসরি নির্দেশ দানার্থ সম্বোধন করিয়াছেন, তাহারই সমর্থন আমরা তাহার ফরমানে পাইয়া থাকি। ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা তাহার খোদাপরাস্তির যে অসাধারণ পরিচয় পাইয়াছি, তাহা যে কোন নবীর ক্ষেত্রে সঠিকভাবেই প্রযোজ্য।

এখন শুধু একটিমাত্র ব্যাপারের বিশ্লেষণ বাকী রহিল। অর্থাৎ ইয়াজুজ-মাজুজ দ্বারা কোন্ জাতিকে বুঝান হইয়াছে তাহা এখনও আলোচনা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন জুলকারনায়েন যে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তিই বা কতটুকু পাওয়া যাইতেছে?

ইয়াজুজ-মাজুজ

কোরআন মজীদের দুই স্থানে ইয়াজুজ-মাজুজ উল্লেখ করা হইয়াছে। একবার সূরায়ে কাহাফ এবং আরেকবার সূরায়ে আম্বিয়ায়। সূরায়ে আম্বিয়ায় বলা হইয়াছে :

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

(এমনকি ইয়াজুজ-মাজুজগণকে মুক্তি দান করা হইবে এবং তাহারা পাহাড়ের ঝর্ণাধরার ন্যায় উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে।)

প্রাচীন যুগের ইতিহাসেই সর্বপ্রথম ইয়াজুজ মাজুজের উল্লেখ দেখা যায়। হযরত হাযকীলকে (আঃ বুখ্‌ৎ নসর বায়তুল মুকাদ্দসে তাহার সর্বশেষ আক্রমণ পরিচালনার সময়ে গ্রেফতার করিয়া বাবেলে লইয়া গেলেন। তিনি এমনকি সাইরাসের আবির্ভাব পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাহার ঐশী-গ্রন্থে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পরিদৃষ্ট হয়।

"অনন্তর খোদাতায়ালার বাণী আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তিনি বলেন : হে আদম সন্তান তুমি জুজদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নবুয়তের কার্য পরিচালনা কর। মাজুজদের দেশবাসী এবং রুশ, মস্ক ও তুবালের সর্দার- জুজগণের প্রতি খোদাওন্দ বলিতেছেন : আমি তোমাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছি। আমি তোমাদিগকে ব্যর্থতা সহকারে প্রত্যাবর্তন করাইব। তোমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী, অশ্বাদি, জংগী পোশাক পরিহিত প্রহরী দল, শিবিরবাসী এবং তরবারিধারণকারী সকলকেই নিরস্ত্র ও বিধ্বস্ত করিব। আমি তৎসংগে পারস্য, কুশ ও 'ফউত' বাসীগণকেও টানিয়া লইব।। তাহারাও শিবিরবাসী ও জংগী পোষাকধারী। অধিকন্তু জাওমরের এবং উত্তর সীমান্তের পাপী অধিবাসীবৃন্দের সৈন্যদলকেও তৎসংগে ধ্বংস করিব।

অতঃপর বহুদূর পর্যন্ত ইহার বিশ্লেষণ দান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ-

ভাবে চারিটি কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, জুজগণ উত্তর দিক হইতে আগমন করিবে এবং লুটতরাজ হইবে তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, মাজুজদের এবং বিশেষ দ্বীপবাসীদের উপর ধ্বংস নামিয়া আসিবে। তৃতীয়তঃ, যাহারা ইসরাঈলীদের শহরে বসবাস করিবে তাহারাও মাজুজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং মাজুজদের অসংখ্য অস্ত্র ও অশেষ সম্ভার তাহাদের হস্তগত হইবে। চতুর্থতঃ, মাজুজদের ধ্বংসক্ষেত্র বা গোরস্তান পথিকদের চলার পথে অবস্থিত কোন এক ময়দানে হইবে। উক্ত স্থান হইবে এক সমুদ্রের পূর্বতীরে। তাহাদের মৃতদেহগুলি বহুদিন অবধি সেখানে পড়িয়া থাকিবে। পথিকবৃন্দ তাহাদিগকে চরণাঘাতে ক্রমশঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিবে। এইভাবে তাহাদের পথ পরিষ্কার হইবে। (৩৯-৩৮ অধ্যায়)

একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই সাইরাসের আবির্ভাব এবং ইয়াহুদীদের 'সুখ-শান্তি ও আজাদীর' ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক তখনই বর্ণনা করা হইয়াছে যখন হযরত হাযকীলও (আঃ) দিব্য দৃষ্টিতে বনী ইসরাঈলীদের শুষ্ক হাড়গুলিকে পুনরুজ্জীবিত হইতে দেখিয়াছিলেন। কোরআন শরীফে এ ঘটনাটি সূরায়ে বাকারার ভিতরে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন :

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا

(অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি পল্লী অতিক্রম করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, উহাকে সম্পূর্ণ উলটাইয়া রাখা হইয়াছে।)

সুতরাং-জুজ ও মাজুজের ঘটনাবলী সেই যুগেরই সন্নিকটবর্তী কোন সময়ের হওয়া অপরিহার্য। তাহা হইলে নিঃসন্দেহে উহা সম্রাট সাইরাসের যুগ ছিল। সুতরাং সাইরাসের জুলকারনায়েন হইবার পক্ষে ইহাও একটি প্রমাণ হইল। কেননা কোরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে, তিনিই ইয়াজুজ ও মাজুজের গতিরোধ করিবার জন্য একটি প্রাচীর তৈরী করিয়াছিলেন।

প্রাচীন যুগের পরে এই নামের উল্লেখ হযরত ইউহান্নার (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে দেখা যায়। উহাতে বলা হইয়াছে :

যখন সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইবে, শয়তান কয়েদ মুক্ত হইবে এবং সে পৃথিবীর চতুর্দিকে বিস্তৃত ইয়াজুজ-মাজুজ জাতিকে বিভ্রান্ত করতঃ মানব জাতি ধ্বংসের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় অশেষ হইবে এবং তাহারা সমগ্র পৃথিবীর উপরে ছড়াইয়া পড়িবে। (৭১০)

গগ ও মেগগ

ইয়াজুজ-মাজুজ ইউরোপবাসীদের ভাষায় গগ-মেগগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নাম সর্বপ্রথম তৌরাতের অনুবাদ 'সাবয়িনী'তে[১] গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, জুজ ও মাজুজের গ্রীক অনুবাদ কি গগ-মেগগ, না উক্ত নাম গ্রীক ভাষায় পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিল? এই প্রশ্নে তৌরাত তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। কিন্তু অধিক যুক্তি-সংগত ও প্রামাণ্য কথা এই, তাহারা গ্রীক দেশে পূর্ব হইতেই উক্ত নামে কিংবা উহার কাছাকাছি কোন নামে পরিচিত।

এখন জিজ্ঞাস্য, তাহারা মুলতঃ কোন জাতি ছিল? সমস্ত ঐতিহাসিক নিদর্শন এইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য দুই জাতি নহে এক জাতি। আর তাহারা সেই দুর্ধর্ষ দস্যু জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতিই নহে, যাহারা এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করিত এবং যাহাদের দুর্ধর্ষ অভিযান প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ হইতে শুরু করিয়া খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত সর্বদাই পশ্চিম দিকে পরিচালিত হইত। অধিকন্তু যাহাদের পূর্বমুখী অভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য চীনজাতি কর্তৃক অজস্র মাইল ব্যাপিয়া এক মহা প্রাচীর গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। তাহাদের বিভিন্ন শাখা ইতিহাসে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের সর্বশেষ গোত্রটি ইউরোপে 'মোগা' নামে পরিচিত হইল এবং এশিয়ায় তাহাদিগকে দুর্ধর্ষ তাতার নামে অভিহিত করা হইল। তাহাদের অন্যতম শাখাকে

---

১ 'সাবয়িনী' অনুবাদ দ্বারা তৌরাতের সেই অনুবাদকেই বুঝায় যাহা সর্বপ্রথম গ্রীক ভাষায় ইস্কান্দারিয়ার শাহী নির্দেশে করা হইয়াছিল এবং যাহাতে সত্তরজন ইহুদী ওলামা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রীকগণ সিথিয়ান নামে অভিহিত করিয়াছিল এবং তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই সাইরাস প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মঙ্গোলিয়া

উত্তর-পূর্ব এশিয়ার উক্ত অঞ্চলটি বর্তমানে মঙ্গোলিয়া নামে পরিচিত। কিন্তু মঙ্গোলিয়া শব্দের প্রাথমিক রূপ কি ছিল? তজ্জন্য আমরা যখন চীনের ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর দিকেই তাকাই কেননা, উহা মঙ্গোলিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র তখনই জ্ঞাত হই, উহার প্রাচীনতম নাম ছিল 'মোগ'। নিঃসন্দেহে এই 'মোগাকেই খৃষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বে গ্রীকগণ 'মেগ' এবং মেগাগ' ইত্যাদি নামে ডাকিত। ইবরানী ভাষায় উহাই হইল 'মাজুজ'।

চীনের ইতিহাসে আমরা সেই এলাকায় অপর একটি জাতির সন্ধান পাই। তাহাদিগকে বলা হইত 'ইউয়াচী' (Yueh-chi)। বলাবাহুল্য, এই 'ইউয়াচী' নাম বিভিন্ন জাতির ভাষা ও উচ্চারণের পার্থক্যের দরুন শেষ পর্যন্ত ইবরানীতে আসিয়া 'ইয়াজুজ' হইল।

এই ব্যাপারটি সুস্পষ্টরূপে অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন জাতির গোত্রীয়, ভৌগোলিক ও ভাষাগত পার্থক্যের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে বিরচিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে গৃহীত মূলনীতির উপর সামগ্রিকভাবে একবার চক্ষু বুলাইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

ভূমণ্ডলের ঊর্ধ্ব ভাগের যেই অংশটি পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত এবং যাহাকে আজকাল মঙ্গোলিয়া ও চীনা তুর্কিস্থান বলিয়া অভিহিত করা হয়, উহা প্রাচীন যুগের বহু জাতির আবাসস্থল ছিল। ইহা আদম সন্তানদের এরূপ একটি ফোয়ারা ছিল যেখানের পানি সর্বদাই স্ফীত ও রাশিকৃত হইতে থাকিত এবং যখনই উহা অত্যাধিক বাড়িয়া যাইত, বাঁধ ভাঙ্গিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্লাবন বহাইয়া দিত। উহার পূর্বে চীন, পশ্চিমে ও দক্ষিণে পশ্চিম-দক্ষিণ এশিয়া এবং উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপ অবস্থিত। সেমতাবস্থায় একের পর এক জাতি ও গোত্র সেখানে হইতে বাহির হইয়া ঐ সমস্ত এলাকায় যুগে যুগে উৎপীড়ন চালাইতে থাকিত। তাদের

একদল পরে মধ্য এশিয়ায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করিল। কতিপয় গোত্র আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এমন কি উত্তর ইউরোপ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল। একদল মধ্য এশিয়া হইতে দক্ষিণ দিকে নামিয়া গেল এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া জয় করিয়া লইল। অতঃপর তাহারা এই সব এলাকা হইতে যেসব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে সেখানকার রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া তদঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের মূল এলাকার বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রহিল। এমনকি তথায় পুনরায় এক একটি গোত্র মাথা চাড়া দিয়া উঠিল এবং কোন এক নূতন স্থানে পৌঁছিয়া সেখানে এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই দুর্ধর্ষ জাতি তাহাদের দানব প্রকৃতির উপর স্থির রহিল। যে সমস্ত গোত্র তাহাদের মূল ভূমি ত্যাগ করতঃ অন্যত্র গিয়া বসবাস শুরু করিল, তাহারা তদঞ্চলের পরিবেশে ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সভ্যতায় বিমণ্ডিত হইয়া চলিল। এমন কি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহাদের অবস্থা এই দাঁড়াইল, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের প্রাচীন দেশবাসীদের কোনই সম্পর্ক রহিল না। কেননা তাহারা দিন দিন সুসভ্য হইতেছিল, অথচ তাহাদের দেশবাসী সেইভাবে দস্যু প্রকৃতির রহিয়া গেল। প্রবাসীদল যখন যুদ্ধে উন্নত ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করিত তখন দেশীয় দস্যুদল হিংস্র ও দুর্ধর্ষ স্বভাবসুলভ অস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িত। প্রবাসীদের ভিতর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা বিস্তারলাভ করিতেছিল, পক্ষান্তরে দেশীয় দল ছিল উহা হইতে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। শীতপ্রধান এলাকার যাযাবর জীবন ও দানব প্রকৃতির প্রচণ্ডতা তাহাদিগকে সভ্য জাতির জন্য এক ত্রাস সঞ্চারক জাতিরূপে সৃষ্টি করিল।

ঐতিহাসিক যুগের দ্বারোদঘাটনের পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গোত্র-গুলির হিজরত পর্ব শুরু হইয়াছিল এবং সেই ধারা ঐতিহাসিক যুগেও বহুদিন পর্যন্ত অব্যাহত রহিল।

সেই গোত্রসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি দল আর্য জাতি নামে পরিচিত হইল। তাহাদের একটি অংশ মধ্য এশিয়া হইতে ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইল। একদল নিম্নদিকে অবতরণ করতঃ হিন্দুকুশ পার হইয়া পাঞ্জাব এলাকায়

বসবাস করিতে লাগিল। একদল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া পারস্য, মেডিয়া ও আনাতোলিয়াকে আবাসভূমিতে পরিণত করিল। উক্ত দলকেই নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যদল। কেননা তাহারা ভারত ও ইউরোপ উভয় অঞ্চলের আর্যদের উর্ধ্বতন পুরুষ ছিল। তাহাদের যেই দলটি উত্তর ভারতে বসবাস করিতে লাগিল, তাহারা তাহাদের ক্তরীয় নাম চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিল এবং তাহাদিগকে সর্বদা আর্য বলিয়া পরিচয় দান করিয়া চলিল। যাহারা পারস্য ও মেডিয়া বসবাস করিতে লাগিল, তাহারা উক্ত অঞ্চলকে 'এরিয়ানা' নামে পরিচিত করিয়া কতকটা গোত্রীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিল। আবেস্তা গ্রন্থে উহাকেই বলা হইয়াছে 'এরিয়ান ভেগো।' যাহারা আনাতোলিয়ায় পৌঁছিল সম্ভবতঃ তাহারাই 'হিট্টি' সম্প্রদায় নামে পরিচয় লাভ করিল। উক্ত নামই 'তৌরাতের' মূল গ্রন্থে 'হিত্তি' ও মিশরের প্রাচীন লেখকের পাণ্ডুলিপিতে 'খিত্তি' রূপ ধারণ করিয়াছে।

তাহাদের যে দলটি ইউরোপ পৌঁছিল, তাহারা গথ, ফ্রাঙ্ক, আলামান ভেণ্ডাল, টিউটান এবং রাহান নামে পরিচিত হইয়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া গেল। তাহাদের একটি প্রধান শাখা কৃষ্ণসাগর হইতে দানিয়ুব নদীর উপরিভাগ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের নাম দেওয়া হইল, সিথিয়ান সম্প্রদায়। মধ্য এশিয়ায় পূর্বাঞ্চলে যে গোত্র বেক্ট্রিয়ায় (বলখ) আসিয়া লুটতরাজ করিত তাহাদিগকে সিথিয়ান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং দারা তাহার ইস্তাখারের শিলালিপিতে তাহাদিগকে সেই নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

সেই গোত্রের যে তিনটি শাখা উত্তর ভারত, আনাতোলিয়া এশিয়া মাইনর এবং ইরানে বসবাস করিতেছিল, তাহাদের এমন পরিবেশ মিলিল যাহা কৃষিকার্যে তাহাদিগকে উপযোগী করিয়া তুলিল। সুতরাং যথাশীঘ্র তাহারা কৃষিজীবী জাতিতে পরিণত হইল এবং ধীরে ধীরে মানুষের স্বাভাবিক সভ্যতা ও প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু যেই শাখাটি ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইল, তাহারা অনুরূপ কোন পরিবেশ পাইল না তাই যাযাবর জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যই তাহাদের মধ্যে যথারীতি অবশিষ্ট রহিল এবং কয়েক শতাব্দী অবধি উহাতে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইল

না। ফলে উক্ত সম্প্রদায়ের তিন অবস্থা দেখা দিল।

প্রথম, খাস মঙ্গোলিয়ান দল। তাহারা তাহাদের দুর্ধর্ষতা ও যাযাবরী কার্যধারা অব্যাহত রাখিল এবং তাহাদের পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রহিল।

দ্বিতীয়, কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে এবং উত্তর ইউরোপে বসবাসকারী দল। তাহারা স্বীয় পূর্বপুরুষগণ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ধর্ষ স্বভাবের আশু পরিবর্তন দেখা দিল না।

তৃতীয়, ভারত, ইরান ও এশিয়া মাইনরে বসবাসকারী দল। তাহারা ধীরে ধীরে শহর ও পল্লীর অধিবাসীতে রূপান্তরিত হইয়া চলিল এবং কালক্রমে তিনটি প্রাচীন সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইল।

ইয়াজুজ মাজুজ কাহারা ?

যীশুখৃষ্টের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মৃত্যুরও পাঁচশত বৎসর পরবর্তী কাল পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজ বা গগ-মেগগ নাম প্রথমোক্ত দল দুইটিকেই দেওয়া হইয়াছিল। প্রথমোক্ত দলকে এইজন্য উক্ত নাম দেওয়া হইয়াছিল যে, দেশ ও জাতির বিচারে তাহারাই ছিল মুলতঃ ইয়াজুজ-মাজুজ। দ্বিতীয় দলকে এইজন্য বলা হইত যে, যদিও তাহারা স্বীয় পুরাতন দেশ ও জাতি হইতে পৃথক হইয়াছিল, তবুও তাহাদের দুর্ধর্ষ স্বভাবের কোনই পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল না। তৃতীয় দলের ভিতরে যেহেতু কিছুটা পরিবর্তিত স্বভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাই তাহারা ইয়াজুজ-মাজুজ আর রহিল না; বরং তাহারা তাহাদের ধ্বংসাত্মক অভি-যানের শিকারে পরিণত হইল।

অবশ্য খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে যখন ইউরোপীয় শাখার ভিতরেও কিছুটা পরিবর্তন শুরু হইল এবং খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহারা কতকটা সভ্য, শান্ত ও গৃহবাসী হওয়া শুরু করিল, তখন হইতে ধীরে ধীরে তাহাদের মূল নামও বিস্মৃতির অতল তলে বিলুপ্ত হইয়া চলিল। কেননা, কোন জাতিই তাহাদের নাম স্মরণ রাখিবার জন্য বাধ্য রহিল না। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজ নাম শুধু সেই বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল—যেখানহইতে তাহারা

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ার যাযাবরগণকেই ইয়াজুজ-মাজুজ বলা হইত। বস্তুত, সূরায়ে আম্বিয়ায় তাহাদের যে অভিযানের খবর দেওয়া হইয়াছে, তাহা মঙ্গোলিয়ার তাতারদের শেষ বর্বর অভিযান ছিল।

বর্তমান ইউরোপের সকল জাতিই (ল্যাটিন সম্প্রদায় ব্যতীত) যে উক্ত সম্প্রদায়ের বংশধর, ইহা অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও সার্বজনস্বীকৃত সত্য।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত, মানব সন্তানের ধারা প্রায় সকল অবস্থাতেই প্রথমে যাযাবর বেশে এবং পরে গৃহবাসী রূপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। যাযাবর জীবন হইতে ক্রমে তাহারা বিশেষ দেশের স্থায়ী অধিবাসী হিসাবে জীবন যাপন শুরু করিল। সেই অবস্থা হইতেই জগতে উভয় দলের অস্তিত্ব কম ও বেশি বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবন পদ্ধতির এই দুইটি অবস্থা পরস্পর এরূপ বিপরীতমুখী ছিল যে, একই বংশসম্ভূত দুইটি পরিবারের একটি পরিবার প্রান্তরে ও অপর পরিবারটি গৃহে বাস করিত। ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তাহারা একদল অপর দলের নিকট শুধু অপরিচিতই হইত না; বরং একেবারে বিপরীত ধর্মী হইয়া উঠিত। প্রান্তর বাসীদের খাদ্য বন্য জন্তু শিকারের উপর নির্ভর করিত; পক্ষান্তরে গৃহবাসী-দের খাদ্য ছিল বিভিন্ন তরিতরকারী ইত্যাদি। তাহারা মুক্ত মাঠে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহিত অবস্থায় জীবন যাপন করিত, ইহারা ক্ষেত-খামার ও ঘর-বাড়ির চারদেয়ালের মধ্যে বসবাস করিত। তাহাদের জীবনের পরিবেশ ছিল মুক্ত প্রান্তর; ইহাদের পরিবেশ ছিল নাগরিক। তাহাদের নিরাপদে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অহরহ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইত; ফলে দৈহিক শক্তি চর্চা ও পরিশ্রম তাহাদের নিকট প্রিয় ছিল। পক্ষান্তরে ইহারা বদ্ধ পরিবেশে দৈনন্দিন দুর্বল ও আরাম প্রিয় হইয়া চলিল। তাহারা উত্তোরত্তর দুর্ধর্ষ ও রক্ত পিপাসু হইয়া চলিল, ইহারা দিন দিন নাগরিক জীবনের অপরিহার্য পরিণতিস্বরূপ নম্র ও ভদ্র প্রকৃতির হইয়া চলিল। প্রান্তর বাস ও যাযাবর জীবনের অপরিহার্য ফল দাঁড়াইল এই, তাহারা রুক্ষ মেজাজ এবং দুর্ধর্ষ প্রকৃতির হইয়া উঠিল।

স্থূল কথা, এইভাবে কালক্রমে গৃহবাসীগণ সভ্য ও শান্ত জাতিতে পরিণত হইল এবং প্রান্তরবাসী যাযাবরগণ অসভ্য দুর্ধর্ষ জাতিতে পরিণত

হইল। সেমতাবস্থায় যদি কখনও উভয় দলের মধ্যে কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, তখন নাগরিকবৃন্দ দেখিতে পাইত, যাযাবর দল দৈত্যের ন্যায় ভয়ংকর এবং হিংস্র জন্তু হইতেও ভয়াবহ। পক্ষান্তরে প্রান্তরবাসী যাযাবর দল দেখিত, খুন-খারাপ ও লুট-তরাজের জন্য শহরের অধিবাসীদের ন্যায় সহজ শিকার আর কোথাও নাই।

অবশ্যই যাযাবর জাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল এবং গৃহবাসীদের রীতিনীতি সম্পর্কে তাহাদের অনুরক্তি ছিল না আদৌ। শহরবাসীগণ সর্বদা মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিত। তাহারা জীবন পদ্ধতির জন্য সুশৃঙ্খল বিধান অনুসরণের পক্ষপাতী। এইজন্য স্বভাবতই যাযাবরদের আক্রমণের ফল একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যাযাবর দল ভয়ংকর জানোয়ারের ন্যায় শহরবাসীদের উপর আপতিত হইয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চালাইয়া সরিয়া পড়িত। কখনও তাহারা স্থায়ী-ভাবে থাকিতে কিংবা কোন শহরের উপর স্থায়ী দখল প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিত না। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে আবার যখন তাহাদের মধ্যে শাসন ক্ষমতাসম্পন্ন কোন নেতার আবির্ভাব হইত, তখন তাহারা কতিপয় গোত্র সংঘবদ্ধ হইয়া একটি সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তুলিত। ফলে হত্যা ও লুটতরাজের উহা এমন এক সুসংহত শক্তি হইয়া দাঁড়াইত যে, শুধুমাত্র সামরিক আক্রমণ চালনাই নহে; বরং বিভিন্ন জাতি ও দেশের উপর তাহারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া শাসনক্ষমতা দখল করিয়া বসিত। তখন এমন কি শহর-বাসীদের বিরাট দখলও তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে সেই অসভ্য যাযাবর জাতির সংগের সুসভ্য শহরবাসীদের এই সংঘর্ষ যুগে যুগে অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছিল। অবশেষে শহরবাসীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সংগে সংগে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিখিলে তাহারা স্বভাবতই দুর্বল হইয়া পড়িল এবং বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিল।

বস্তুত, উত্তর পূর্ব এশিয়ার গোত্রগুলির ইতিহাস উক্ত সত্যের বিবরণীতেই পরিপূর্ণ। তাহাদের যেই শাখাটি শহর জীবন অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইল। পক্ষান্তরে, যাহাদের সেই সৌভাগ্য হয় নাই

আসহাবে কাহাফ

তাহারা রীতিমত যাযাবরই রহিয়া গেল। অতপর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তাহাদের মধ্যে এমন সব নেতার আবির্ভাব দেখা গেল যাহারা সংহতি ও শৃংখলার রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিল। সেই হইতে সহসা তাহাদের শক্তির নবযুগ শুরু হইল। বস্তুত, আমরা দেখিতে পাই, সেই নূতন গোত্রের সর্দার ছিল এটিলা। সে অচিরেই দিগ্বিজয়ী বীর রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এমন কি তাহার দুর্ধর্ষ অভিযানের কবলে পতিত হইয়া রোমকদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল এবং রোমক সাম্রাজ্যের সংগে সংগে রোমক সভ্যতাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল।

কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা দিল। আমরা দেখিতে পাই, খাস মঙ্গোলিয়ায় চেঙ্গিজ খান নামক এক দুর্ধর্ষ তাতার নেতার আবির্ভাব ঘটিল। সে সমগ্র তাতার জাতিকে এক ঝাণ্ডার নীচে সমবেত করিল। অতঃপর এই সংঘবদ্ধ জাতির সাহায্যে সে ধ্বংস ও বিজয়ের এমন এক ব্যাপক প্লাবন শুরু করিল যে, ইসলামী দেশসমূহের মত সুসভ্য শক্তি ও উহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। মধ্য এশিয়া হইতে ইরাক পর্যন্ত যত দেশ ও জাতি তাহার সম্মুখে পড়িল, জঞ্জালের ন্যায় ভাসিয়া গেল।

যাহা হউক, উপরোক্ত ব্যাপক বিশ্লেষণের পরে এক্ষণে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই দুর্ধর্ষ মঙ্গোলিয়ান জাতিই ইয়াজুজ-মাজুজ নামে খ্যাত ছিল এবং কোরআন শরীফে যে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা বলা হইয়াছে, এই জাতি ও উহার শাখা-প্রশাখাগুলিই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য হইল তাহাদের আবির্ভাব ও অভিযানের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা। তাহা হইলে ইহাও পরিষ্কার হইয়া যাইবে যে, সাইরাসের যুগে এই জাতি কোথায় অবস্থান করিতেছিল এবং তিনি কী কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে রক্ষা প্রাচীর গড়িয়া তুলিলেন?

এই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা ইতিহাস হইতে নিম্ন সাক্ষ্য পাইতে পারি:

(১) প্রথম যুগ হইল প্রাগৈতিহাসিক যুগ। সে সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে

এতটুকু জানা যায়, তখন উত্তর-পূর্ব এলাকা হইতে প্রথমে তাহাদের একটি দল মধ্য এশিয়ায় আসিয়া বসবাস শুরু করে। সেখান হইতে ক্রমশ তাহারা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হইতে থাকে। এই আগমন ও সম্প্রসারণের ধারা অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হয়। তাহাদিগকে বহু ধারা অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় যুগ প্রাথমিক ঐতিহাসিক যুগ। দূরে বহুদূরে আবছা স্নানালোক ও অপর্যাপ্ত জানা-শোনার সাহায্যে শুধু তাহাদের পাশাপাশি দুইটি বিপরীতমুখী জীবনের সন্ধান লাভ করা যায়। উত্তর ভারত, ইরান ও এশিয়া মাইনরের বিক্ষিপ্ত গোত্রসমূহ ক্রমে ক্রমে শহর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মধ্য এশিয়া হইতে শুরু করিয়া কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় যাযাবর গোত্র জুড়িয়া রহিল। অধিকন্তু সে অঞ্চলে পূর্ব এলাকা হইতে নূতন নূতন গোত্র আসিতে লাগিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দকে উক্ত কাল ধরা যাইতে পারে।[১]

(৩) তৃতীয় যুগটি ইতিহাসের আলোকে সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। ইহা খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে শুরু হইয়াছে। বর্তমান কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া এক অসভ্য রক্ত পিপাসু জাতি বাস করিত। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভিন্ন দিকে পরিচিত ছিল। সহসা আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহাদিগকে সিথিয়ান নামে আবির্ভূত হইতে দেখি। তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে শুরু করিয়া কৃষ্ণ-

---

১ এই সব নির্ধারণ অন্যান্য সব নির্ধারণের প্রায় শুধুমাত্র ইতিহাসগত অনুমানের ভিত্তিতেই করা হইয়াছে। এই জন্য ইতিহাসবেত্তা ও সমালোচকদের মধ্যে উহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়েছে। অবশ্য ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা প্রায় সুনির্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের এশিয়া মাইনরের 'হিত্তি' সম্প্রদায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদের সমসাময়িক ছিল। 'বুগাযকুই'-এ হিত্তিদের যে লাইব্রেরী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহাতে প্রায় বিশ হাজার নকশা অংকিত তক্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীরইতিহাসবেত্তাদের বহু জল্পনা-কল্পনারই অবসান ঘটাইছে। এক্ষণে সেই সভ্যতার কালকে নিকটবর্তী করার খেয়াল প্রায়ই উধাও হইয়াছে।

সাগরের উত্তর উপকূল পর্যন্ত এলাকা জুড়িয়া বসবাস করিত। সেখান হইতে তাহারা প্রায়ই প্রতিবেশী এলাকাসমূহে আক্রমণ লুঠতরাজ চালাইতে থাকিত। এ যুগটি হইল আশুরীয় সভ্যতার আবির্ভাব এবং বাবেল ও নিনুয়ার উত্থান কাল। হিরোডোটাসের ভাষায় আমরা জানিতে পারি, আশুরীয়দের উত্তর সীমান্তে সিথিয়ানদের আক্রমণ সর্বদা অব্যাহত ছিল। উক্ত সীমান্ত কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূল হইতে আর্মিনিয়ার পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহারা ককেশাশের গিরিপথ পার হইয়া আশুরীয় জনপদসমূহের উপর আক্রমণ ও লুটতরাজ চালাইত। অতঃপর খৃঃ পূঃ ৬৩০ অব্দে সহসা তাহাদের একটি বিরাট দল সেই গিরিপথ পার হইয়া রাইনের সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল বিধ্বস্ত করিল। গ্রীক ইতিহাসকারদের মতে আশুরীয় সাম্রাজ্যের পতনের মূলে উক্ত ধ্বংসলীলাই অধিক সক্রিয় ছিল।

(৪) চতুর্থ যুগ খৃঃ পূঃ ৫৫০ হইতে ধরা যাইতে পারে। এই সময়ে সাইরাসের উত্থান এবং মেডিয়া ও পারস্যের মিলিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগেই পশ্চিম এশিয়ার সকল জাতি সিথিয়ানদের আক্রমণ হইতে নিস্তার করে। সেই হইতে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সিথিয়ানদের আক্রমণের আর কোন ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় না। এই যুগে শুধু দুইটি স্থানে তাহাদের সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম ব্যাপারটি সাইরাসের সময়কার। তাহাতে দেখা যায়, তিনি বাবেল বিজয়ের পূর্বে সিথিয়ানদের আক্রমণ হইতে সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইয়াছেন। দ্বিতীয় উল্লেখ দেখিতে পাই সম্রাট দারার যুগে। সম্রাট দারা বসভোরাস উত্তীর্ণ হইয়া দানিয়ুব নদীর উপকূলভাগে পৌঁছেন এবং সেই জাতিকে বহুদূর পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসেন।

দারার আক্রমণের পর তাহাদের দৌরাত্ম্য উত্তর ইউরোপের দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৫ পঞ্চম যুগ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে শুরু হইয়াছে। সেই যুগের মঙ্গোলীয়ানদের এক নূতন অভিযান শুরু হয় এবং সেই ধ্বংসাত্মক প্লাবন প্রথম চীনের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন রাজপথ ধরিয়া উহা অগ্রসর হইতে থাকে। চীনের ইতি-

হাসে তাহাদিগকে হিউংনু (Hiung Nu) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই নামই কালক্রমে 'হুন' নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই যুগেই চীন সম্রাট হিং হুয়াংটি উক্ত ধ্বংসলীলা হইতে দেশকে রক্ষার জন্য এক মহাপ্রাচীর গড়িয়া তোলেন। উহাই চীনের মহাপ্রাচীর নামে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। উক্ত প্রাচীর পনের শত মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহার তৈরী শুরু হয় খৃঃ পূঃ ২১৪ অব্দে। কথিত আছে, তিনি উত্তর ও পশ্চিম দিক হইতে মঙ্গোলিয়ার সকল দুর্ধর্ষ গোত্রের আক্রমণের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্যই তাহাদের গতি আবার মধ্য এশিয়ার দিকে ফিরিল।

(৬ ষষ্ঠ যুগ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তখন হইতে উক্ত সম্প্রদায় ইউরোপে এক নূতন অভিযানের সূত্রপাত করিল এবং শেষ পর্যন্ত রোমক সাম্রাজ্য ও রোমক সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটাইল।

৭) সপ্তম ও শেষ যুগটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী এবং ষষ্ঠ হিজরী হইতে শুরু হইয়াছে। তখন মঙ্গোলিয়ায় আবার নবীন উদ্যমে একটি গোত্রের উত্থান ঘটে এবং চেঙ্গিজ খান তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া নূতন এক দুর্জয় জাতির সৃষ্টি করেন।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর আলোকে এ ব্যাপারটি এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ার সমগ্র এলাকা সিথিয়ানদের আক্রমণে উত্যক্ত ছিল এবং যে হস্ত সাহসা আবির্ভূত হইয়া সেই আক্রমণ বন্ধ করতঃ পশ্চিম এশিয়াকে রক্ষা করিল তাহা হইল সম্রাট সাইরাসের হস্ত। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, মঙ্গোলীয়া বংশসম্ভূত এই সিথিয়ান জাতিকেই ইয়াজুজ বলা হইত এবং জুলকারনায়েন অর্থাৎ সাইরাস তাহাদের পথ বন্ধ করিবার জন্যই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এখন চিন্তা করিবার বিষয় এই, সিথিয়ানদের এই আক্রমণ কোনদিক হইতে পরিচালিত হইত? হিরোডোটাস প্রমুখ গ্রীক ইতিহাসকারগণ বলেনঃ- সেই একমাত্র পথটি হইল ককেশাশের গিরিপথ। এই পথটিই কয়েক শতাব্দী অবধি উভয় এলাকার মধ্যকার সংযোগসূত্র ছিল।

পোরাহা করা হইল

এমতাবস্থায় সিথিয়ানদের আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য সাইরাসের পক্ষে সেই পথ রুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না এবং সেই জন্যই তিনি উক্ত পথে প্রাচীর রচনা করিয়াছিলেন। ফলে, ইয়াজুজ গোত্রের আক্রমণ হইতে পশ্চিম এশিয়া মোটামুটি রক্ষা পাইল।

এক্ষণে হাবকীল নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর একবার দৃষ্টিপাত করুন। তিনি জুজকে রুশ, মস্ক ও তুবালের সর্দার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর সেই সব গোত্রের নাম তাহাদের ভিতরেই দেখা যায়। রুশ গোত্রের আবাসস্থল রুশিয়া নামে পরিচিত হইয়াছে। মস্ক গোত্রের নামানুসারেই মস্কো শহরের পত্তন হইয়াছে। তুবাল কৃষ্ণসাগরের উপরিভাগকে বলা হয়।

উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অতঃপর বলা হইয়াছে: "তোদেরকে ফিরাইয়া রাখিব এবং তোদের চোয়ালের ভিতরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব।"

ইহাও সাইরাসের ঘটনা। কেননা তিনিই সিথিয়ানগণকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং তাদের আগমন পথ প্রাচীর নির্মাণপূর্বক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইল: "তাদের সকল হাতিয়ার জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের পূর্বতীরে এক প্রান্তরে তাদের গোরস্তান হইবে। এক যুগ অবধি পথিকবৃন্দ তাদের লাশগুলিকে পদদলিত করিয়া মাটিতে প্রোথিত করিবে। এইভাবে ক্রমে সে রাস্তা পরিষ্কার হইবে।"

এই ঘটনা দারার ইউরোপ আক্রমনের ফল ছিল। দারার সৈন্যবাহিনী সাম্রাজ্যের সকল জাতির সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ইয়াহুদীদের বিরাট অংশ ছিল। তিনি বসফোরাস পার হইয়া পূর্ব ইউরোপে পৌঁছিয়াছিলেন। যদিও গ্রীকদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাহাকে শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, তবুও উক্ত অভিযানে অসংখ্য সিথিয়ান নিহত হইয়াছিল। সে জাতি এমনি কয়েক যুগের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এক্ষণে শুধু ইউহান্নার "কাশফ-গ্রন্থ" ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই অভিযানের

ব্যাপারেও ইঞ্জীলের ব্যাখ্যাকারগণ নীরব হইয়া গিয়াছে। উহাতে ইহাকে এক হাজার বৎসরের ঘটনা বলা হইয়াছে। প্রশ্ন জাগে, তদ্দ্বারা কোন্ কাল বুঝান হইয়াছে এবং কখন হইতে উহা শুরু হইল? যদি হযরত ঈসা (আঃ) হইতে উক্ত কালের প্রারম্ভ ধরা হয়, তাহা হইলে সুস্পষ্ট দেখা যায়, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অনুরূপ কোন ঘটনাই ঘটে নাই। সেই ক্ষেত্রে এই অনুমানই করা চলে, উহা দ্বারা বাবেল পতনের দিবস হইতে যে কাল শুরু হইয়াছে, তাহাই বুঝান হইয়াছে। কেননা কালের বর্ণনা বাবেল পতনের পরক্ষণেই করা হইয়াছে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আরেকটি ব্যাপার দেখা দেয়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাবেলের পতন ঘটে এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মঙ্গোলিয়ানগণ রোম সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ শুরু করে। সুতরাং দেখা যায়, ইয়াজুজ-মাজুজের এই অভিযান বাবেল শহরের পতনের এক হাজার বৎসর পরে পরিচালিত হয়।

মাজুজের উল্লেখ তৌরাতের "জন্ম-বৃত্তান্ত" খণ্ডে রহিয়াছে। হযরত নূহের (আঃ) তিন পুত্র—সাম, হাম ও ইয়াফেস হইতেই দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া উহাতে বলা হইয়াছে। তদনুসারে ইয়াফেস সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহার বংশে "জমর, মাজুজ, মাদ্দী ইউনান, তুবাল, মসক এবং তীরাস জন্মলাভ করিয়াছে।"

এই বর্ণনা অনুসারেও বুঝা যায়, মাজুজ দ্বারা মঙ্গোলীয় জাতিকেই বুঝান হইয়াছে কেননা, প্রাচীন ইতিহাসকারগণ উক্ত বর্ণনার ভিত্তিকেই তাহাদিগকে ইয়াফেস বংশের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন এই কথাও যদি মানিয়া লওয়া হয়, তৌরাতের "জন্ম বৃত্তান্ত" খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত তথ্যাদি বাবেল অবরোধের সময়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝা যায়, মাজুজ এবং মাদ্দীগণকে সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা হইত।

স্মরণ রাখা উচিত. যদিও বিশ্বাসীগণ এক সময়ে "জন্ম-বৃত্তান্ত" খণ্ডের উক্ত বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে করিত এবং দুনিয়ার সকল মানুষ হযরত নূহের (আঃ) তিন পুত্র হইতেই আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত; কিন্তু বর্তমানে উহার ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের মর্যাদায় উহাকে আজকাল অনেকেই

দেখিতে প্রস্তুত নহে। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর ইয়াহুদীদের চিন্তাধারার এক দাস্তান হিসাবেই আজ আমরা উহাকে দেখিয়া থাকি। নিঃসন্দেহে উহাতে এমন কিছু পবিত্র বাণীও রহিয়াছে যাহা জাতীয় স্মৃতিশক্তির ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তৎসংগে বাবেলী ও আশুরীয় বর্ণনা-সমূহ যুক্ত হইয়াছে এবং উহা বাবেল পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী দীর্ঘকালেরই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল।

ইয়াজুজ প্রাচীর

এখন আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় এই, সাইরাসের নির্মিত প্রাচীরের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থিতি কোথায়? বর্তমান মানচিত্রের কোন্ স্থানে উহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে?

কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম উপকূলের দরবন্দ নামক এক প্রাচীন শহর রহিয়াছে। উহা ককেশাশ পর্বতমালার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগর ও ককেশাশ পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে উহার অবস্থিতি দেখা যাইতেছে। তথায় প্রাচীনকাল হইতেই একটি সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত প্রাচীর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিম উপকূলে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং ককেশাশ পর্বতের পূর্বভাগের সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। এইভাবে উহা একদিকে সাগরের উপকূল ভাগ এবং অপর দিকে পর্বতের অতিক্রম্য নিম্ন ও সমতলভাগ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

উহার উপকূলের অংশটি দ্বিত্বভাবে নির্মিত। অর্থাৎ আজারবাইজান হইতে যদি উপকূল বরাবর সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে একটি প্রাচীর এরূপ দেখা যাইবে যে, উহা সাগরের তীর ধরিয়া সোজাসুজি পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহাতে পূর্বে একটি দ্বার ছিল। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই দরবন্দ শহরে পৌঁছা যাইত। এখন তদ্রূপ অবস্থা নাই। দরবন্দ হইতে পুনঃ একটি দেওয়াল সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই দ্বিত্ব প্রাচীর মাত্র দুই মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। উহার পর হইতে একক প্রাচীর শুরু হইয়াছে।

উভয় দেওয়াল যেখানে পৌঁছিয়া মিলিয়া গিয়াছে, তথায় একটি দুর্গ

রহিয়াছে। সেই দুর্গের নিকট পৌঁছিয়া উভয় প্রাচীরের দূরত্ব একশত গজের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। অথচ উপকূল ভাগে উভয়ের মধ্যকার ব্যবধান ছিল পাঁচশত গজ এবং উভয়ের মাঝখানেই দরবন্দ শহর অবস্থিত। ইরানে প্রাচীনকাল হইতেই উহা "দো বারা" অর্থাৎ দ্বিত্ব প্রাচীর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

এ কথা সর্ববাদীসম্মত, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে—সাসানীদের রাজত্বকালে উক্ত স্থান যথাযথভাবে বিদ্যমান ছিল। উহাকে দরবন্দ অর্থাৎ 'রুদ্ধ-দ্বার' বলা হইত। কেননা, মোকাদ্দাসী, হামদানী, মাসউদী, ইস্তাখারী, ইয়াকুত এবং কযবিনী ইত্যাদি সকল মুসলিম ইতিহাসকার ও ভূগোল শাস্ত্রবিদ উক্ত নামেই উহাকে অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা লিখিয়াছেন সাসানী আমলে উহা পশ্চিম উপকূলের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। কেননা, উক্ত পথেই উত্তরাঞ্চলের আক্রমণকারীদল ইরানের দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইত। সুতরাং উহাকে ইরান দেশের কুঞ্জী রূপে বিবেচনা করা হইত। যাহার হস্তে সেই কুঞ্জী থাকিত সে পূর্ণ দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। এই জন্যই উহা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য ছিল।

মুসলমানগণ হিজরী প্রথম শতাব্দীতে যখন উক্ত অঞ্চল জয় করিল, তখন সাসানীদের ন্যায় তাহারাও উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিল। তাহারা উহাকে "বাবুল আবওয়াব" অর্থাৎ সকল দ্বারের দ্বার নাম দিল। উহাকে কোথাও বা "আল-আব' অর্থাৎ একমাত্র দ্বার বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। কেননা, সাম্রাজ্যের উহাই উত্তর দ্বার ছিল এবং প্রাচীরের অন্যান্য দ্বারের মধ্যে উহাই শেষ দ্বার। কেহ কেহ উহাকে "বাবুত্‌ তুর্ক" ও বলিয়াছেন। কেননা, তাতার এবং তদ্বংশসম্ভূত ককেশীয়দের যাতায়াত পথ ছিল উহাই।[১]

---

১ আরবের ভূগোল শাস্ত্রবিদগণ উহাকে 'দরবন্দ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তবে যেহেতু 'বাবুল-আবওয়াব' নামে উহা প্রচলিত ছিল, তাই অধিকাংশ লেখক শিরোনামায় উক্ত নামই ব্যবহার করিয়াছেন। ইয়াকুত 'মোজেমুল বোলদান' গ্রন্থে 'বাবুল আবওয়াব' নামই ব্যবহার করিয়াছেন।

এই স্থান হইতে উত্তরদিকে ককেশীয়ার অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইলে দারিয়াল গিরিপথ (Darial Pass) নামে খ্যাত এক শহর পাওয়া যায়। বর্তমানে উহা ব্লাডি কাওকয্ (Vladi Kaukaz) নামে পরিচিত এবং উহা তিফলিসের মধ্যভাগে অবস্থিত। উক্ত পথটি ককেশাশের উচ্চতম অংশ অতিক্রম করিয়াছে এবং বহুদূর পর্যন্ত উহা উচ্চতম শৃঙ্গ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এখানেও প্রাচীন কালের একটি প্রাচীর দেখা যায় এবং আর্মেনিয়ানদের মধ্যে উহা "আহেনী দরওয়াযা" নামে পরিচিত।

এখন প্রশ্ন হইল, এই প্রাচীর কে নির্মাণ করিয়াছেন? আরবের সকল ইতিহাসকার একবাক্যে বলেন, উহার নির্মাতা সম্রাট নওশেরোয়াঁ। এমন কি মাসউদী তাঁহার নির্মাণ কার্যের বিভিন্ন বর্ণনাও দান করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালের সকল ইতিহাসবেত্তাগণ উহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু যখন আমরা প্রাক-ইসলাম যুগের ইতিহাসকারদের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তখন জানিতে পারি, বাদশাহ নওশেরোয়াঁরও বহুপূর্ব হইতে এখানে একটি প্রাচীর বর্তমান ছিল। সর্বপ্রথম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বিখ্যাত ইতিহাসকার জুযিফস্ উহার উল্লেখ করেন। অতঃপর প্রোকোপিয়াস (Procopius) খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। ৫২৭ খৃষ্টাব্দে যখন রোমক সেনাপতি 'বেলিসারিয়াস' (Balisarius) উক্ত এলাকা আক্রমণ করেন তখন প্রোকোপিয়াস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নওশেরোয়াঁর রাজত্বকাল হইল ৫৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, উক্ত প্রাচীর বাদশাহ নওশেরোয়াঁর দ্বারা নির্মিত হয় নাই।

সেকান্দার প্রসংগে

এখানে আরেকটি সন্দেহ অবশিষ্ট রহিয়াছে। জুযিফস্ ও প্রোকো-পিয়াস উভয় ইতিহাসকারই উক্ত প্রাচীরের নির্মাতা নির্দেশ করিয়াছেন সেকান্দারকে (আলেকজান্ডার)। মূলতঃ সেকান্দার শাহের দিগ্বিজয়ের বিবরণ ইতিহাসে পুরাপুরি সংরক্ষিত রহিয়াছে। উহাতে তিনি উক্ত এলা-কায় কখনও পদার্পণ করিবার কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায় নাই।

বর্তমান যুগের মার্কিন ইতিহাসকার মিঃ ভি. উইলিয়াম জেকসন (অধ্যাপক, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত এলাকা পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং স্বীয় ভ্রমণ কাহিনীতে[১] উহার বিস্তারিত বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি উহা নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্যার নিম্নরূপ সমাধান নির্দেশ করিয়াছেনঃ শাহ সেকান্দারের কোন সেনাপতি উক্ত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ দারিয়াল গিরিপথ সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত জোরের সহিতই গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর সাসানী শাসকবৃন্দ উহাকে আরও ব্যাপকতা ও পূর্ণতা দান করিয়াছেন। যেহেতু প্রাথমিক নির্মাণ কার্য শাহ সেকান্দার কর্তৃক শুরু হইয়াছিল সুতরাং উহাকে 'সেকান্দার প্রাচীর' নাম দেওয়া হইয়াছে।[২]

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, শাহ সেকান্দার এবং তাহার সকল সেনাপতির সমগ্র কার্যবিবরণী স্বয়ং তাহার সংগীগণই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং উহাতে যখন কোথাও ককেশীয়ার যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা প্রাচীর নির্মাণের বিবরণ পাওয়া যায় না, তখন কি করিয়া আমরা পরবর্তীকালের ইতিহাসকারগণের স্বকপোল-কল্পিত কাহিনীর উপর নির্ভর করিতে পারি ?

এই ধরনের সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন তো তখনই দেখা দিতে পারে, যখন বিশেষ কোন নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু শাহ সেকান্দারের সমগ্র বিজয়ের ইতিহাসে এ ধরনের কোন প্রয়োজনীয়তারও উল্লেখ দেখা যায় না। তাহার যুগে উক্ত এলাকা ইরানের প্রাচীন শাহী বংশের করতলগত ছিল। তিনি সিরিয়ার দিক হইতে ইরানের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। অতঃপর মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিয়া ভারত আক্রমণ করেন। ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ব্যাবিলনে তাহার মৃত্যু ঘটে। সেক্ষেত্রে এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যে জন্য তাহাকে

---

১ উক্ত অধ্যাপকের রচিত "From Constantinople to the Home of Omar Khayam" দ্রষ্টব্য।

২ 'সেকান্দার প্রাচীর' নাম হওয়ার অরেকটি কারণ এ হইতে পারে যে, পরবর্তীকালের কোন কোন ইতিহাসকার ভুলবশতঃ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পর্বতমালাকেই ককেশাশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শাহ সেকান্দার মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসিবার সময় সেই এলাকা অতিক্রম করিয়া আসেন।
বিখ্যাত ইতিহাসকার স্ট্রাবু এই ভ্রান্তিটির প্রতি বিশেষভাবে ইংগিত করিয়াছেন।

ককেশীয়ায় সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিতে হইল ? আর যদিই বা সেরূপ কোন প্রয়োজন দেখা দিয়া থাকে, তাহা কখনই বা তিনি সমাধা করিলেন ?

মূল ঘটনা এই, উক্ত প্রাচীর শাহ সেকান্দারের দুইশত বৎসর পূর্বে সম্রাট সাইরাস নির্মাণ করিয়াছেন এবং দারিয়াল গিরিপথে অবস্থিত প্রাচীরের কথাই কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নবর্ণিত কারণ ও নিদর্শন দ্বারা উক্ত মতের সমর্থন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, সম্রাট সাইরাস ও সম্রাট সেকান্দার উভয়ের ঘটনাবলীই আমরা ইতিহাসের আলোকে দেখিতে পাইতেছি। সাইরাসের সময়ে উক্ত এলাকা হইতে সিথিয়ানদের হামলা সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে শাহ সেকান্দারের জীবনে অনুরূপ কোন আক্রমণের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং সাইরাসের রাজত্বকালেই উক্ত পথ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল, সেকান্দারের রাজত্বকালে নহে। সাইরাসের বিবরণ সম্পর্কে বিখ্যাত ইতিহাসকার হিরোডোটাস ও যীনোফোনের সাক্ষ্য মিলিতেছে। তাহাতে দেখা যায় সাইরাস লিডিয়া (এশিয়া মাইনর) বিজয়ের পর সিথিয়ানদের গতিরোধ ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শাহ সেকান্দার সম্পর্কে কোন ইতিহাসকারের এরূপ কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাই-তেছে না। এ উভয় দিক দিয়া আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ঐতিহাসিক সূত্র গড়িয়া ওঠে, তাহাতে সাইরাসকেই উক্ত প্রাচীরের নির্মাতা না ভাবিয়া গত্যন্তর থাকে না। সেক্ষেত্রে সেকান্দার কিংবা তাঁহার সেনানায়কদের কাহাকেও উহার নির্মাতা কল্পনা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রোকোপিয়াস ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসকারগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, ট্যাসিটাস (Tacitus) এবং লীডাস (Lydus) বলেন, রোমকগণ উহাকে "কাস্পিয়ান পোর্টা" অর্থাৎ "কাস্পিয়ান দ্বার" নামে ডাকিত। কিন্তু তাঁরাও উহাকে সেকান্দার কর্তৃক নির্মিত বলিয়া কোন ইংগিত দান করেন নাই।

তৃতীয়তঃ, সাইরাসের নির্মাণ কার্যের সমর্থনে এরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যদ্দারা তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উহা হইল আর্মেনীয় শিলালিপির সাক্ষ্য। যেহেতু উহা উক্ত এলাকার নিকটবর্তী নিদর্শন, তাই

উহাকে স্থানীয় সাক্ষ্য মনে করা যাইতে পারে।

আর্মেনীয় ভাষায় উহার প্রাচীন নাম পাওয়া যায় "চাক কোরাই" এবং "কাপান কোরাই"। উভয় নামেরই তাৎপর্য হইল 'কোরের গিরিপথ'[১]। এখন প্রশ্ন জাগে যে, 'কোর দ্বারা কি বুঝা যাইতে পারে? ইহা কি খোরেশ-এর পরিবর্তিত রূপ নহে? খোরেশ ছিল সাইরাসের আদি নাম। দারার শিলালিপি খণ্ডে আমরা উক্ত নামই পাইয়া থাকি।

অধ্যাপক জেকসন উক্ত আর্মেনীয় নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি 'কোর' কে 'সোর' উচ্চারণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উহার মূল আরবী 'সোল' শব্দকে নির্ণয় করিয়াছেন। এইভাবে শব্দের মূল রহস্যকেই তিনি লুকাইয়া ফেলিয়াছেন।

এক্ষণে আরেকটি প্রশ্ন বিবেচনা করিবার রহিয়াছে। জুলকারনায়েন যে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন উহা দারিয়াল গিরিপথের প্রাচীর, না দরবন্দের প্রাচীর? অথবা তিনি কি উভয় প্রাচীরের নির্মাতা?

কোরআনে আমরা পাই, জুলকারনায়েন দুই পর্বত শৃংগের মধ্যখানে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি লোহার পাত দ্বারা প্রাচীর নির্মাণকার্য সমাধা করিয়াছেন। প্রাচীরের দ্বারা মধ্যভাগ ও পার্শ্ব ভাগের উচ্চতার সামঞ্জস্য রক্ষা পাইয়াছে। উহাতে তিনি তাম্র ঢালাই করিয়াও ব্যবহার করিয়াছেন। নির্মাণকার্যে এই সব বিশেষত্ব কিছুতেই দরবন্দ-প্রাচীরের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় নাই। উহা বড় বড় প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত হইয়াছে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যভাগেও অবস্থিত নহে; বরং সাগর হইতে পাহাড়ের উন্নতভাগ পর্যন্ত উহা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। উহাতে লোহার পাত কিংবা ঢালাই করা তাম্রের কোন চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, উহা জুলকারনায়েনের নির্মিত প্রাচীর নহে।

---

১ দরবন্দনামা, পৃঃ ২১। দরবন্দের ইতিহাসের ভিতর উহা একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত তুর্কী ইতিহাসকার কাজেম বেক উহা রচনা করিয়াছেন। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে উহার ইংরেজী অনুবাদ "History of DARBAND" নামে প্রকাশিত হয়।

অবশ্য দরিয়াল গিরিপথের প্রাচীরকে জুলকারনায়েনের প্রাচীর বলা যাইতে পারে। উহাতে উপরোক্ত বিশেষত্বসমূহ যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। কোরআনে বর্ণিত সকল লক্ষণই উহাতে বিরাজমান। উহা দুই পাহাড়ের চূড়ার মধ্যভাগে অবস্থিত এবং উক্ত প্রাচীর নির্মাণের ফলে গিরিপথটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া ছিল। যেহেতু ইহার নির্মাণকার্যে লৌহের পাত ব্যবহার করা হইয়া ছিল, তাই আমরা দেখিতে পাই, জর্জিয়ার জনসাধারণ প্রাচীন কাল হইতে উহাকে 'লৌহ-কপাট' নাম দিয়া আসিতেছে। উহাই তুর্কী ভাষায় ''দামরকেপু'' নামে মশহুর হইয়াছে।

যাহা হউক, মূলতঃ জুলকারনায়েনের প্রাচীর ইহাই। সম্ভবতঃ কিছু পরে স্বয়ং তিনি কিংবা তাহার কোন পরবর্তী বাদশাহ কেস্পীয়ার পূর্বোপকূল-ভাগকেও বিপদমুক্ত করিবার মানসে দরবন্দের প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছেন। এবং বাদশাহ নওশেরোয়াঁ উহাকেই সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থিররূপদান করিয়াছেন। হয়ত বা দরবন্দের প্রাচীর স্বয়ং বাদশাহ নওশেরোয়াঁরই অমর কীর্তি।

দরবন্দ প্রাচীরের বর্তমান অবস্থা

দরবন্দের স্থির প্রাচীর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইচওয়াল্ড (Eichwald) নামক জনৈক রুশ পরিব্রাজক স্বীয় 'কায়য়াকেসিস' নামক গ্রন্থে উহার চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রোফেসর জেকসন যখন উহা পরিদর্শন করেন, তখন উহার নিদর্শন বাকী ছিল মাত্র। স্থির প্রাচীর তখন কালের গর্ভে প্রায় বিলীয়মান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একক ও ধারাবাহিক প্রাচীরের মাঝে মাঝে কিছু কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

তৌরাতের অধুনা ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে একদল সিথিয়ান গোত্রকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলিয়া অভিমত পেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা হযরত হাযকীল নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সিথিয়ানদের উপর যে আক্রমণ ও উৎপীড়ন দেখা দেয় উহাকে খৃঃ পূঃ ৬৩০ অব্দের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ

---

৯ মিঃ কাজেম বেক কর্তৃক অনূদিত দরবন্দনামা, ২৯ পৃঃ। অধ্যাপক জেকসন উক্ত নামের উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকেই প্রাচীনকালের নাম বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। (From Constantinople to the Home of Omar Khayam Page 91)

করেন। হিরোডোটাসই উক্ত আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে এই অসুবিধা দেখা দেয়, হাযকীল নবীর গ্রন্থ রচিত হয় বাবেল অবরোধকালীন অবস্থায় এবং তিনি স্বয়ং বখ্‌ত নসরের বন্দীদের অন্যতম ছিলেন। অথচ সিথিয়ানদের সেই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয় উহারও অনেক পূর্বে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতির জন্য 'ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' ও 'য়ুয়িশ ইনসাইক্লোপেডিয়ার' 'গগ' শব্দের বিশ্লেষণ অনুধাবনীয়।

আমি জুলকারনায়েন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলাম। কেননা, বর্তমান যুগের কোরআন বিরোধী বন্ধুগণ এই স্থানে আসিয়াই তাহাদের ছিদ্রপের নগ্নরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, জুলকারনায়েনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ইহা কেবল আরব দেশের ইয়াহুদীদের এক কাল্পনিক কাহিনী ছিল মাত্র এবং ইসলামের পয়গাম্বর স্বীয় সরলতার দরুন উহাকেই সত্য ভাবিয়া পবিত্র গ্রন্থে উধৃত করিয়াছেন।

এইজন্যই এ ব্যাপারটিকে এরূপভাবে সন্দেহাতীত করিয়া তোলা প্রয়োজন যেন পরে আর কাহারও শত্রুতা উদ্ভাবের কোন সুযোগ না থাকে

উপসংহার

... ...

(১) আমি সাইরাসের যে চরিত্র উপরে চিত্রিত করিয়াছি তদ্বারা পরিষ্কারভাবে এ কথা জানা গিয়াছে, জুলকারনায়েন সাইরাসের (১) উপাধি ছিল মাত্র। তাহা প্রাচীন শিলালিপিতেও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। তদুপরি বর্তমান যুগের সকল গবেষকদের সিদ্ধান্ত এই, গ্রীকগণ যদি কোন এশীয় সম্রাটের প্রতিকৃতি প্রস্তরে অংকিত করিয়া থাকেন, তাহা একমাত্র সম্রাট সাইরাসের ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। ইরানের প্রাচীনতম রাজধানী ইস্তাখারের প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে সাইরাসের সেই মর্মর নির্মিত প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এখানে সম্রাট দারা শাহী প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখন সেখানে কয়েকটি মর্মর নির্মিত ভগ্ন গম্বুজ অবশিষ্ট রহিয়াছে। উহারই একটি বৃত্তাকার গম্বুজের উপর এই প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল।

সর্বপ্রথম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেমস মোরিয়ার (James Morrier) উহা দ্বারা জ্ঞানের জগতে নতুন আলোর সংযোগ সাধন করেন। উহার কিছু-দিন পরে স্যার রবার্ট কেয়ারপোর্টার (Sir Robert Keer Poirter) সেই স্থানের তথ্যাবলী সংগ্রহ করতঃ সাইরাসের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি তাহার জর্জিয়া ও ইরান ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে উক্ত প্রতিকৃতির একটি চিত্র পেন্সিল দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তখন পর্যন্তও প্রাচীন পাহলভী ভাষা এবং মিথী-হরফের জটিলতা সম্পূর্ণ রূপে দূর হইয়াছিল না। এতদসত্ত্বেও এতটুকু কথা পরিষ্কার হইয়াছিল যে, উক্ত প্রতিকৃতি সম্রাট সাইরাসের। পরবর্তীকালের অনুসন্ধানকার্য উহার সত্যতাকে দৃঢ়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডি লাফু (Die Lafoy) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Lart antique enperse-এ উহার বহু প্রতিকৃতি তুলিয়া দিয়াছেন। এইভাবে সেই প্রকৃতির যথার্থ রূপ দুনিয়ার সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই হইতে অদ্যাবধি সেই প্রতিকৃতি প্রাচীন ইতিহাসের এক সার্ব-জনীন পর্যালোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

এই, পাশ্চাত্যে কোন ইতিহাসকারের চিন্তায় অদ্যাবধি এ কথাটি যাগরাক হইল না যে, উহা কোরআনে উল্লেখিত জুলকারনাইনেরই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আমি অবশ্য এ কথা বলিতে পারি না যে, এই পলায়নী মনোবৃত্তি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত। কেননা, সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত আবহাওয়ামুক্ত বহু ইতিহাসকারও তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও কথা না বলিয়া গত্যন্তর নাই. এই অজ্ঞতার অভিনয় শিক্ষা ও গবেষনার ক্ষেত্রে খুবই বিস্ময়কর।

(২) সাইরাসের প্রতিকৃতির শিরোপরি দুইটি শিং দেখা যায় এবং পার্শ্বদেশে শকুনের ন্যায় পাখা রহিয়াছে। শিংদ্বয়ের তাৎপর্য অবশ্য বিশ্লেষিত হইয়াছে। কিন্তু শকুনের পাখা জুড়িয়া দেওয়ার তাৎপর্য কি? ইহার জওয়াবও আমরা ইয়াসইয়াহ নবীর পবিত্র গ্রন্থে পাইয়া থাকি। সেখানে সাইরাসের আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া ইহাও বলা হইয়াছে।

দেখ, আমি এক শকুনকে পূর্বদিক হইতে আহ্বান জানাইতেছি। আমি সেই ব্যক্তিকেই ডাকিতেছি দূর হইতে আসিয়া যে আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে।

ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, দুই শিং-এর ব্যাপার যেইরূপ দানিয়াল নবীর স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তেমনি শকুনের পালকও ইয়াসইয়াহ নবীর স্বপ্ন ও ভবিষ্যদ্বাণী হইতে আসিয়াছে—হউক তাহা পরবর্তীকালের সুষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা পূর্ববর্তীকালের। কিন্তু এ কথা এখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুই শিং ও শকুনের পাখার কল্পনা কেবলমাত্র সম্রাট সাইরাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তাঁহার প্রতিকৃতিতে উহা যথাযথই স্থানলাভ করিয়াছে।

—সমাপ্ত—

মাওলানা আজাদ বলেন ঃ

"যে ভাবেই হোক আমার সম্পর্কে দু'টো ধারণা চালু হয়ে আসছে। কিছু লোক আমাকে ভাল মনে করেন। সেটা তাদের মনের ঔদার্য বটে। কিছু লোক আবার আমাকে খারাপ জানেন। তাদের অন্তর আমার প্রতি বিমুখ।

আমি কি আর কি না তার মীমাংসা আজ নয়—কাল হবে। জীবনকে আমি বইয়ের খোলা পৃষ্ঠার মত সবার সামনে রেখে দিয়েছি। তা থেকেই সবাই বিচার করতে পারবে, আমি কতটুকু ভাল বা মন্দ।

* * *

"সত্য বটে পুলসেরাতের পথ চিকুর থেকেও চিকন, আর তরবারি থেকে ধারাল এবং তার নিচেই জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তা শুধু আখেরাতের শিকায় তুলে রাখছি কেন? এ দুনিয়াই তো হচ্ছে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। তাই এখানের যাত্রাপথেও সবার সামনে পুলসেরাত পাতা রয়েছে। তা হচ্ছে চরিত্রের দুর্গম পথ।"

(আমর বিল মা'রূফ)

মাওলানা আজাদ সম্পর্কে ঃ

"দুনিয়ার সব মানুষ প্রকৃতির যেসব অবদানের জন্য সদা লালায়িত, মাওলানা আজাদের ভেতর তার সবগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল। তবে তাঁর ভেতরে দুর্বোধ্য দু'টো পরস্পর বিরোধী শক্তিও স্থান লাভ করেছিল। তা হচ্ছে পূর্ণতার ভেতরে অপূর্ণতার সহানুভূতি। মানে, নিজে পূর্ণ হয়েও চারপাশের অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির বেদনায় সতত ছিলেন তিনি অধীর।"

—হুমায়ুন কবীর

"মাওলানার ব্যক্তিত্ব ও জীবন সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় তিনি মানুষ রূপে ফেরেশ্‌তা ছিলেন। তাঁর জীবন ধারা ছিল যেন কোন ফেরেশ্‌তারই জীবন ধারা।"

—ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ

"যুগে যুগে বড় বড় নেতার আবির্ভাব ঘটেছে ও ঘটবে। কিন্তু মাওলানার ভেতরে যে শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, তা ভারতে কেন, দুনিয়ার কোথাও দেখা যায় না। তাঁর জ্ঞানালোক ছিল আমার নিত্যকার পথের দিশারী।"

—পণ্ডিত নেহরু